অভিভাবক—

মাননীয়—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায়, এম্, এ,

হেড মাষ্টার জেঙ্কিন্স স্কুল, কুচবিহার।

দ্বিতীয় শ্রেণী,

জেঙ্কিন্স স্কুল, কুচবিহার।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা ও

বার্ষিক মূল্য ২৷০ আনা।

অঞ্জলি

সূচীপত্র, পৌষ—১৩২৪।

নিবেদন

আমরা আজ সকলে মিলিয়া আমাদের আরাধ্যা দেবীর পূজা করিতে আসিলাম। যে দেবী নিখিলনিবাসী জনের হৃদয় অমৃত প্লাবনে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছেন; যিনি বিশ্ববাসীজনের নয়নে জ্ঞানের আলোক উদ্ভাসিত করিয়াছেন; যে দেবীর বীণার সুললিত ঝঙ্কারে ধরণী মুগ্ধা হইয়া রহিয়াছে; সেই ভারতী দেবীর অর্চ্চনার উপযোগী উপচার আমরা কোথায় পাইব? নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক সাধকগণ যে চন্দনে মায়ের পূজা করিয়া থাকেন, যে বিল্বপত্র মাতৃ-পদে উৎসর্গ করেন আমাদের সে চন্দন সে বিল্বপত্র কোথায়? যে ধূপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া মায়ের মন্দির সুরভি করা হয় সে ধূপ আমাদের নাই। ভক্তগণ যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মাতৃমন্দির মুখরিত করেন, যে সঙ্গীতে মায়ের উপাসনা করিয়া থাকেন; আমাদের কণ্ঠে সে মন্ত্র সে সঙ্গীত নাই। সাধকগণ যে সাধনা যে ভক্তির বলে মায়ের আশীষ লাভ করেন সে সাধনা কোথায়? সে ভক্তি কই? তবে আজ কি দিয়ে মায়ের পূজা করিব? আমরা শুধু একমন, একপ্রাণ লইয়া; একটী সরল বিশ্বাস লইয়া; হৃদয় ভরা ভক্তি লইয়া; আর তুচ্ছ হীন এই "অঞ্জলি" লইয়া মাতার চরণ বন্দনা করিতে আসিয়াছি। সন্তান তার জননীর কাছে শত অপরাধ করিলেও জননী তাঁর হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহবশতঃ সন্তানের সকল দোষ ক্ষমা করিয়া থাকেন। তাই, আমাদের সাধনা ক্ষুদ্র হইলেও, অর্থহীন হইলেও আমরা আশা করি যে মায়ের চরণতলে আমাদের এ তুচ্ছ "অঞ্জলিও" একটু স্থান পাইবে। তাই সকলে জননীর শ্রীচরণকমলে এই "অঞ্জলি" অর্পণ করিলাম।

প্রার্থনা করি জননী আমাদের উপর তাঁহার "আশীষ ধারা" বর্ষণ করুন।

হৃদয়ে যে কামনা লইয়া আজ আমরা মায়ের পূজার মন্দিরে প্রবেশ করিলাম; জানি না সে কামনা পূর্ণ হইবে কিনা। যে আশায় হৃদয়োদ্যানে এই বাসনা-বীজ বপন করিলাম জানি না কালে উহা পত্রে, পুষ্পে সুশোভিত হইয়া ফল প্রদানে সমর্থ হইবে কিংবা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে। বিশেষতঃ আমাদের সেরূপ উদ্যম ও সৎ-সাহস নাই যে কেবলমাত্র নিজেদের চেষ্টায় "অঞ্জলির" পরিপোষণে সমর্থ হইব। তাই পূজনীয় শিক্ষক মহাশয়গণের স্নেহ এবং বিদ্যালয়স্থ সহৃদয় ভ্রাতৃবৃন্দের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করি। আশা করি এ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইব না। নিবেদনমিতি।

বিনীত—

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ।

অঞ্জলি

"আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা॥"

১ম বর্ষ } পৌষ, ১৩২৪ { ১ম সংখ্যা।

বাণী অর্চ্চনা

(১)

সুশীতল নীল অমল অসীম মানব-মানস সরে
উত্থিতা অয়ি জননী মোদের কি মোহন রূপ ধরে
হৃদয়-সরোজ-আসনে আসীনা ক্ষৌম বসন পরি,
মরাল উপরে চরণযুগল ফুল বীণা করে ধরি
উজলিয়া দিশি কিরীট আভায় সুমধুর বীণাতানে
আয় আয় ব'লে ডাকিতেছে অই নিখিল নিবাসী জনে
এস ভ্রাতঃ! গাই মঙ্গলগীতি মিলায়ে কণ্ঠধ্বনি
ত্বং হি জননী জগন্মোহিনী করমূলে বীণাধারিণী।

(২)

ঊষার আলোকে শিশিরসিক্ত বিকশিত ফুলগুলি
বিতরি সৌরভ সুষমার রাশি সজল নয়ন মেলি
দেখে জননীর অপরূপ রূপ মুগ্ধ ব্যাকুল প্রাণ
চরণের তলে ফুল্ল জীবন বাসনা করিতে দান।
ঐ যে সুনীল অম্বর হ'তে অমিয় বরষ ছলে
করিছে কুসুমরাশি বরিষণ যত সুরবালা দলে

আমরাও তাই চরণের মূলে আসিয়াছি জুড়ি পাণি
নমামি ত্বাং মা বিশ্বজননী অজ্ঞানতমোনাশিনি।

(৩)

অলক্তরঞ্জিত চরণযুগল প্রভাত অরুণ জিনি
রাজিতেছে তায় কনকনূপুর সদা বাজে রিনি রিনি
পুস্তকরাজি শোভিতেছে অই নিরমল করমূলে
কণ্ঠে শোভিছে মুকুতার হার শ্রবণে কুণ্ডল দোলে
কেমন বিশ্ব-বিমোহিনী রূপে জননী মোদের আজ
এসেছে মুগ্ধ করিতে সবারে সাধিতে মাতার কাজ
তুমি মা বিশ্বনয়নদাত্রী ধাত্রীস্বরূপা বাণী
নমামি ত্বাং মা ভারতি দেবি সুত-হৃদ-দুঃখহারিণি।

(৪)

স্বরগ-কল্পনা-কানন হইতে জ্ঞানকুসুম তুলি
তুষিতে জননী সন্তানগণে আনিছে ভরিয়া ডালি
ঐ যে প্রসাদ বিতরিছে মাতা আনন্দে দু'হাত তুলি
গ্রহণ করিছে বিশ্ববাসিগণ তার কণ্ঠে মা, মা বলি
সার্থক তব মা নাম জননী ধন্যা মহিমময়ী
দাও মা মোদের হৃদয়ে শক্তি ভক্তি করুণাময়ি
এস ভ্রাতঃ! গাই পুনঃ জয়গাথা মিলায়ে কণ্ঠধ্বনি
ত্বং হি জননী সুখদা-বরদা তনয়মঙ্গলদায়িনী।

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়।

কবি ও চিত্রকর

নিষ্কর্ম্ম অলস এই একঘেঁয়ে জীবন যাপন করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া নিজকে কোন কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া যখন ক্ষুণ্নমনে বসিয়া আছি; তখন মাথায় হঠাৎ কোথা হ'তে

একটা খেয়াল চাপিয়া গেল। তড়িতের ন্যায় খেয়ালটি আমার শিরায় শিরায় প্রতি ধমনীতে খেলিয়া গেল। আমার এই দুর্ব্বহ জীবনভার যেন তখন অনেকটা লাঘব হইয়া গেল। মনে করিলাম, জীবনটাকে আর এভাবে বসিয়া থাকিয়া মাটী করিব না। একটা কাজ করিব। স্থির করিলাম প্রবন্ধাদি লিখিয়া আমার এ অবশিষ্ট জীবন যাপন করিব; কেননা সংসারের সকল কার্য্যেই আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং সংসারের কোন কার্য্য সাধনই আমার অসাধ্য। তাই, পূর্ব্বোক্তরূপে বাকী জীবন যাপন করাই আমার একমাত্র উপায়। কিন্তু লিখিতে বসিলে কি যে লিখিব তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। তথাপি আজি এ প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি।

এস্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে আমি সাহিত্যিক নহি; সুতরাং আমার এ প্রবন্ধে অশেষ ভ্রান্তি থাকিবে তাহা আর বিচিত্র কি! আপনারা অবশ্য সবাই বলিবেন, তবে তুমি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ কেন? তদুত্তরে আমার এই বলিবার আছে যে আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কর্ম্মশূন্য এ অলস জীবনটাকে একটা কার্য্যে ব্যাপৃত করার জন্যই আমার এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ।

সুতরাং আমি সকলের নিকটেই সহানুভূতি লাভের যোগ্য। আমার জীবনের অবস্থা বুঝিয়া সকলে আমার ভুল ভ্রান্তি মার্জ্জনা করিবেন, কেবল এই ভরসায়ই আমার এ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ। তবে এখন যাহা বলিতে চাই, বলিব কি? কবি ও চিত্রকর সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে অবশ্য অনেকেই অনেক কথা জানেন। তবু ও আমি সেই কথাই পুনরায় বলিব। এক কথা বার বার বলিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন কিছুই নয়, কেবল সময় কাটান। আমার এ উদ্ধত্য সকলে মার্জ্জনা করিবেন এই প্রার্থনা। সংসারে মানব বিবিধপ্রকারে জীবন যাপন করিতেছে, কেহ পরহিত নিজ

জীবনের ব্রত করিয়াছেন; কেহ মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবার জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতেছেন; কেহ বা কেবল নিজের সুখ দুঃখ লইয়া ব্যস্ত, কেবল নিজ পরিবারের উন্নতি সাধনে যত্নবান্ রহিয়াছেন; আর কেহ বিজনে নিভৃতে ভাবের ঘোরে, কল্পনার রাজ্যে তন্ময় হইয়া রহিয়াছেন। আমরা এই শেষোক্ত প্রকারের লোকের সম্বন্ধেই কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ইহাঁরাই কবি। যাঁহারা কেবল শব্দের লালিত্যে, ভাষার মাধুরিমায় সকলকে মোহিত করেন, তাঁহারাই কবি নহেন। তাঁহাদের পরীক্ষা কাব্যে নহে কর্ণে। যিনি কথায় অন্তরের নিগূঢ় লুক্কায়িত ভাব ব্যক্ত করিবেন, যিনি সৌন্দর্য্যের একটা অভিনব মূর্ত্তি মানসপটে উদিত করিবেন; যাঁহার বাক্যের সুললিত ঝঙ্কারে তোমার হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে, যাঁহার ভাব-রসে মানবের মন বিস্ময়ে মূক হইয়া রহিবে, যাঁহার কথায় মায়া মন্ত্রের ন্যায় বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিবে, আত্মবিস্মৃত হইবে আমরা তাঁহাকেই কবি নামে অভিহিত করিব। ঈদৃশ কবির পরীক্ষাস্থল কাব্য। কবি বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি মানবহৃদয়ে সৌন্দর্য্যের একটা আভাস দিবার জন্য বিশ্বপ্রেমের একটা ছায়া প্রতিফলিত করিবার জন্যই বোধ হয় বিধাতা কবির সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি মানবের শিক্ষাদাতা, কবি তাঁহার কাব্যে মানবচরিত্রের দোষগুণ সম্যকরূপে পরিস্ফুট করেন। মানবের কোন অবস্থায় কি পরিণাম হইবে কবি তাহা বলিয়া দেন। তাই কবিকে মানবপ্রকৃতির উচ্চতম পুরোহিত বা "High Priest of Human-nature" বলা হয়। ইংলণ্ডের সেক্সপীয়র উক্ত প্রকারের কবি। কবি ব্যতীত কে মানবের অন্তরের কোমলতা নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি এরূপ উত্তমরূপে পরিস্ফুট করিতে পারেন? কবি সুন্দর। সৌন্দর্য্যের একটা চিত্র প্রদর্শিত করিবেন কবি। কবি ও চিত্রকরকে তাই আমরা এক শ্রেণীর লোক বলিতে পারি। উভয়েই প্রকৃত

সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম। কবি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন কাব্যে আর চিত্রকর সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলেন তাঁহার চিত্রে। কবি যাহা কথায় বর্ণনা করেন চিত্রকর তাহাই নিজ তুলি দিয়া চিত্রে পরিস্ফুট করেন। কবি প্রেমিক। তোমার প্রেম সীমাবদ্ধ আর কবির প্রেম অসীম অনন্ত। তোমার প্রেমাস্পদ শুধু একজন, নয়নের অন্তরালে তাহাকে তুমি দর্শন করিতে পার না আর কবির প্রেমাস্পদ বিশ্বময়। বিশ্বময় কবি তাঁহার প্রেমাস্পদকে মানসনেত্রে দর্শন করেন। তাই কবি বলিতে পারিয়াছেন,

"আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।"

বিশ্বময় প্রেমাস্পদকে দেখিতে কয়জন পারে? কবি অসীমকে সীমার মধ্যে আনয়ন করেন। তুমি তোমার প্রাণের আরাধ্য দেবতাকে বলিবে, "সোণার গৌর তুমি" আর কবি বলিবেন "তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার" হীরক কাঞ্চন কবির নিকট কিছুই নহে; তাই তিনি তাঁহার প্রাণের আরাধ্য দেবতাকে "সোণার গৌর" বলিতে স্বীকৃত নহেন। কবির নয়নে জগতের সকল পদার্থই সুন্দর। সরসী সলিলে চন্দ্রকিরণের নৃত্য সকলেই দর্শন করেন; কিন্তু কে তাহারই মাঝে এক অভিনব সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করেন। কবি ব্যতীত কে সেই চন্দ্রকিরণের সহিত নৃত্য করিবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তুমি যাহা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া একবারও দেখ না কবি তাহাই দর্শন করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া থাকেন। কবির হৃদয়ে তাহার প্রেমাস্পদ ব্যতীত আর কেহই প্রতিষ্ঠিত নহে। তাই কবি গাহিয়াছেন

"অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
"তুমি অন্তর ব্যাপিনী"।

মানবের দুঃখ অবলোকন করিয়া কবির হৃদয় ব্যাকুল ক্রন্দন করে।

মানবের হৃদয়ের সহিত নিজহৃদয় ব্যথিত বা সুখী করিতে সর্ব্বদা তিনি ব্যাকুল। তাই কবি লিখিয়াছেন,

"হৃদয় আমার ক্রন্দন করে মানব হৃদয়ে মিশিতে"

কবি মানবের দুঃখ দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র। তিনি চাহেন সকলেই সুখী হয়; সকলেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্ত মুক্তি লাভ করে। সকলেই এক অনন্ত শান্তি লাভ করে; আর সেই মহান্ ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম অনুভব করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় ভয় ভীতি বিস্মৃত হইয়া অসীম আনন্দসাগরে নিমগ্ন রহে। তাই তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে গাহিয়াছেন,

"জগৎ মাতানো সঙ্গীত তানে
কে দিবে এদের নাচায়ে?
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে।
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতি জালপাশ;
মুক্তহৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ।
বিপুল গভীর মধুর মন্ত্রে
বাজুক বিশ্ব বাজনা।
উঠুক্ চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হয়ে আপনা।
টুটুক বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র,
জাগাক নবীন বাসনা।"

কবি যখন ভাবে তন্ময় হইয়া রহেন, তখন সংসারের দুঃখ কষ্ট

তাঁহার হৃদয়ে আসিতে পারে না। তখন তিনি সংসারের বিবিধ ক্ষুদ্র কোলাহল হইতে বহু ঊর্দ্ধে সমাসীন থাকেন। সংসারের নীচতা ক্ষুদ্রতা সেখানে যাইতে পারে না। কবি প্রেমিক। তাই তিনি চাহেন শুধু, তাঁহার প্রেম বিলাইতে; শুধু নিভৃতে নীরবে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতার পূজা করিতে, ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা ফুটাইয়া তুলিতে, তাই বিহ্বল চিত্তে গাহিতে ইচ্ছা করে,

"অসীমেরে দেহ সীমা, নীরবেরে দেহ ভাষা
তব কাব্য মাঝে,
এঁকেছ সরল করি' জটিলতা নিবিড়তা
যেখানে যা' আছে;
অসীম তুমিই শুধু—সসীমতা দিয়ে বাঁধা
সবই তব কাছে।"

শ্রীব্রজেন্দ্রলাল সরকার।

আবাহন

(১)

পুণ্য-শরত-স্নিগ্ধ-জ্যোছনা আবার ফিরিয়া আসিল।
বিটপীর শাখে, পুলক আবেশে, আবার বিহগ গাহিল।
ধরণী-উজল স্নিগ্ধ কিরণে,
নাহি পয়োধর সুনীল গগনে,
তরু, তরু পরে, সুমধুর স্বরে, যেন কত কথা কহিছে।
নীরবে নীরব ভাষা নিজেদের নিজে নিজে যেন জানিছে

(২)

না জানি কি এক পুলক পরশে সকলের হিয়া ভরিছে।
এস জননি! সন্তান তব আগমনী গীত গাহিছে।

মহানন্দে সবে হয়েছে মগন,
জেনে মা তোমার পূজার লগন,
কুসুম-বন-পল্লব-শাখী তব আগমন জানিয়া,
পুলকে সারা আপন হারা দাঁড়ায়ে রঙ্গে মাতিয়া।

(৩)

মৃদুল বায়ু বহিছে ধীরে স্নিগ্ধ সুবাস ছড়ায়ে।
নব পল্লবে নব প্রসূনে নব অটবী দাঁড়ায়ে।
পশু পাখী সবে আজি সমস্বরে,
করিছে সঙ্গীত হরষ অন্তরে,
আসিবে বঙ্গে তুমি মা রঙ্গে তাইতে হরষে মাতিয়া।
নাচিতেছে কেহ কেহবা গাহিছে মহা পুলকে ভাসিয়া।

(৪)

প্রকৃতি দেবী তোমার লাগি নবীনা মূর্ত্তি ধরেছে।
জানিয়া দেবি! আগমন তব আনন্দে হারা হয়েছে।
শাখায় গাহিছে বিহঙ্গের দল,
ধাইছে তটিনী অতি-চঞ্চল,
পেয়ে অবনী তোমার বারতা পত্রে ভূষিতা হয়েছে।
হরিত ক্ষেত্রে কুসুম পত্রে ভূষিত দেহ করেছে।

(৫)

অম্বরে আর নাহি অম্বুদ সব গরজন গিয়েছে।
স্নিগ্ধ কিরণে মুগ্ধা অবনী সর্ব্ব দিকেরে ছেয়েছে।
ফল ফুল পাতে ভরেছে ধরণী,
পুলকে মগন সকলে জননী;
ত্বরায় সর্ব্ব বিশ্বের মাঝে বারতা তোমার আসিছে।
রাজেন্দ্র দুঃখী বধির অন্ধ সকলে সুখে ভাসিছে।

(৬)

এস মা ভদ্রে! তোমার ক্ষুদ্র পুত্র তোমারে চাহিয়া।
আকুল পরাণ শাশ্রু নয়ান জাগিয়া তোমার লাগিয়া।
বড় সাধ মনে পূজিতে তোমায়,
জাগিছে আমার সদাই হিয়ায়,
তোমারি সৃষ্ট বাদ্যে খাদ্যে অর্চ্চনা করি তোমারে।
নমস্তে ভবানি! ঈশান-ঘরণি! এসগো জননি! কুটীরে।

(৭)

পঙ্গু যে আমি দুরেতে গঙ্গা কেমনে আনিব জল।
কোথায় পাইব পিরিতি ভকতি কোথায় স্বর্গের ফল।
কোনো দিন আমি না জানি ভক্তি;
দেহ হৃদি মাঝে পুণ্য শক্তি;
ত্বাং নমামি মহিমা-ময়ি! রক্ষ জড়তা হ'তে।
যেন শ্রীচরণ আমার এখন, নাহি ত্যজে কোন মতে।

(৮)

চিত্ত কানন কল্পনা হ'তে ফুল্ল কুসুম তুলিয়া।
নিত্য তোমারে ভক্তি করিয়া দেই মা চরণে ঢালিয়া।
সম্বল মম কিছুই মা নাই,
মনে মনে ব'সে ভাবিতেছি তাই,
দীন হীন আমি না জানি পূজনে ঈশানি! মহেশ-জায়া।
যদি করি দোষ ক্ষম ত্রিনয়নি! দিয়ে তব পদছায়া।

শ্রীজ্ঞানেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

যোগবল

ভোর বেলা উঠিয়া সবে মাত্র মুখ ধুইতেছি এমন সময় অতুল আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। আমাকে এত বেলায় মুখ ধুইতে দেখিয়া অতুল বলিল "কি যোগেন আজ বুঝি তোমার উঠিতে দেরী হইয়াছে।" আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম "হাঁ ভাই কাল একটা নভেল পড়িতে পড়িতে একটু অধিক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল তার পর"—বাধা দিয়া অতুল বলিল "যাক্ সে কথা ভাল, কালকের সাপ্তাহিকে পরীক্ষার কোন সংবাদ পাওয়া গেল নাকি"? আমি একটু জোরে শ্বাস ফেলিয়া বলিলাম "না"

অতুল বলিল "বাস্তবিক ভাই আর দেরি সয় না। ফল বাহির হইলেই বাঁচি; খালি গল্প গুজব করিয়া তাস খেলিয়া কিম্বা নভেল্ পড়িয়া আর কতই সময় কাটান যায়; মোটেই ভাল লাগেনা।"

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি আমরা ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষান্তে দীর্ঘ কালের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর হাঁপ ছাড়িয়া বাড়ীতে আসিয়াছি। প্রায় আড়াই মাস ছুটি। অবকাশ নেহাৎ কম নয়। কিন্তু এই দীর্ঘ অবকাশে পরীক্ষার শুভা-শুভের চিন্তা ঘাড়ে করিয়া কেবল তাস ও নভেলে সময় কাটান অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইতেছিল। সঙ্গীর মধ্যে এক মাত্র অতুল। সে আমার সহাধ্যায়ী আমরা উভয়েই এবার ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষা দিয়াছি। অতুল আমার প্রতিবাসী কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাধরণতঃ প্রতিবাসী সম্বন্ধ হইলেও আমাদের সম্বন্ধ একটু ঘনিষ্ঠ রকমের। কেন না আমরা ছেলে বেলা হইতে একত্র পড়া শুনা করিয়া আসিতেছি। প্রথমে উভয়ে গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করি। তারপর আমাদিগের অভিভাবক উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত সহরে ইংরাজি স্কুলে

প্রেরণ করেন। বোর্ডিংএ আমাদের খাবার ও থাকিবার বন্দোবস্ত হয়।

তখন হইতে বরাবর প্রত্যেক ক্লাশে প্রমোশন পাইয়া উভয়েই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার নিমিত্ত নির্ব্বাচিত হইয়া পরীক্ষা দিয়াছি। সুতরাং আমার সহিত অতুলের সম্বন্ধটা যে একটু গাঢ় রকমের হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। অতুল ও আমার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে বলিয়া তার সম্বন্ধে এতটা দীর্ঘ ব্যাখ্যা করিতে হইল। অতুল প্রায় প্রত্যহ আমাদের বাড়ীতে আসিত এবং পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইত এবং হাসি তামাসা ইত্যাদিও চলিত। বিশেষতঃ প্রাতঃভ্রমণটা আমাদের একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। তাই অতুল রোজ সকালে যেমন আসে সে দিন ও তেমনি আসিল।

(২)

আমি তাড়াতাড়ি মুখ ধোওয়া সারিয়া লইয়া প্রাতঃভ্রমণের পোষাক পরিয়া অতুলের সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে যাইতে যাইতে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কথায় কথায় অতুল বলিল, "যোগেন তুমি আমাদের বিনোদ বাবুকে জান বোধ হয় ?" আমি সাগ্রহে বলিলাম "হাঁ, কে ডাক্তার বাবু ত ! তার কি !" বলাবাহুল্য বিনোদ বাবু কখন ও ডাক্তারি পাশ করিয়াছেন কিনা জানি না কিন্তু আমাদের সকলেই তাহাকে ডাক্তার বাবু বলিয়া ডাকে।

অতুল। কল্য জ্যেঠা মহাশয়ের নিকট শুনিলাম বিনোদ বাবু নাকি হরিহরপুরের কোন সাধুর নিকট যোগশিক্ষা করিতেছেন। অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আর দুই বৎসরের মধ্যে নাকি যোগ শিক্ষা শেষ হইবে, তাঁহার গুরুদেব এমত আশ্বাস দিয়াছেন।

আমি। কিসে বুঝিতে পারিলে তাঁহার এতটা উন্নতি হইয়াছে ?

অতুল। জ্যেঠা মহাশয় বলিয়াছেন যে তিনি নাকি গুরুদেবকে দেখিতে দেখিতে সমাধি মগ্ন হন, আর সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া পড়েন।

আমি। তার পর ?

অতুল। তার পর সেই অবস্থায় তিনি তাঁহার গুরুদেবকে দেখিতে পান এবং সেই সময়ে তাঁহাকে যে কোন বিষয় এমন কি কঠিন দার্শনিক তত্ত্বও জিজ্ঞাসা করিলে গুরুদেব তাহার সদুত্তর দিয়া থাকেন।

আমি কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যের ভান করিয়া বলিলাম বাঃ বেশ ত কিন্তু ভাই আমি ও বিষয়ে বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

অতুল। এই ত গেল এক কথা তা ছাড়া আরও কত আশ্চর্য্য কাণ্ড করিতে পারেন।

আমি। আমার কিন্তু আসলে বুজরুকি বোধ হইল। অতুল আমার বিদ্রূপবাক্যে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল "ভাল তর্কে প্রয়োজন নাই। জ্যেঠা মহাশয়ের কাছে চল।" আমি ও "বেশ কথা" বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। তারপর দুইজনে এদিক সেদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া অতুলের বাসায় উপস্থিত হইলাম। অতুলের পিতা বাড়ীতে ছিলেন না। তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা। সংসারের সমস্ত ভার তাঁর উপর। বাহির বাড়ীতে অতুলের জ্যেঠামহাশয় বসিয়া ছিলেন। আমরা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি বসিতে বলিলেন। আমরা পাশের একখানা বেঞ্চে বসিলাম। অতুলের জ্যেঠামহাশয় বৃদ্ধ হইলেও তিনি চলা ফেরা করিতে পারেন। তাঁর নিজের ছেলে পুলে নাই বলিয়া অতুলকে নিজের ছেলের মতন দেখিতেন। ছোট ভাইয়ের (অতুলের পিতার) হাতে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া সংসার হইতে অবকাশ লইয়াছেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অতুল আব্দার করিয়া বলিল "জ্যেঠা মশায় কাল বিনোদ

বাবুর সম্বন্ধে যাহা আমায় বলেছিলেন আজ একবার বলুন না, যোগেন শুন্‌তে চায়।” তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে থাকিয়া বলিলেন “বাবা তোমরা ছেলে মানুষ; তোমরা ও সব তত্ত্বের কি বুঝিবে? প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রগণ্য ছিলেন।” এই বলিয়া তিনি কি সব আধ্যাত্মিক ও আদিভৌতিক প্রভৃতির কথা বলিতে লাগিলেন কি সব যোগ সমাধির কথা জুড়িয়া দিলেন যে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি হাঁ করিয়া রহিলাম। অতুলও ততটা সন্তুষ্ট হইল না। শেষ হইলে অতুলের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। কিছুদূর পথ আসিয়াছি এমন সময় অতুল দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল “যোগেন বেশ কথা চল আমরাই না হয় আজ বিনোদ বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া আসি। দেখা যাক্ ব্যাপারটা কি হয়”। আমি সাগ্রহে অতুলের কথায় সায় দিলাম। যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম তখন প্রায় এগারটা বাজে। তাড়াতাড়ি একটু তেল মাখিয়া স্নান করিতে গেলাম। খাওয়া দাওয়া শেষ করিতে ঠিক বারটা বাজিল। বিশ্রাম করিতে গেলাম।

(৩)

বৈকালে অতুলের সহিত বিনোদ বাবুর দেখা করিতে গেলাম। সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলাম। দেখিলাম বিনোদ বাবু আর সে ডাক্তার বাবু নাই। তাঁহার চেহারার সম্পূর্ণ বদল হইয়া গিয়াছে। দুই বৎসর যাবৎ পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকিয়া বাড়ীতে বড় একটা আসিতে পারি নাই খোঁজও লইতে পারি নাই। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। বিস্ময়বিহ্বলনেত্রে বিনোদ বাবুর সর্ব্বশরীর পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম তাঁহার হেমবর্ণ গৌর কান্তি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সুগোল সুঠাম শরীর শীর্ণ হইয়াছে। চোয়াল বসিয়া গিয়াছে! চক্ষুর্দ্বয় কোটরগত

মাথায় চুলের জটা হইয়াছে মুখ বিবর্ণ। চক্ষু দুইটি লাল টুকটুকে জবা ফুলের মত। সহসা দেখিলে একজন বেজায় চণ্ডুখোর বলিয়া বোধ হয় দুই বৎসরের কঠোর সাধনার ফলে তাঁহার অবস্থা এরূপ হইয়াছে। এবং এই অবস্থাতেই বিনোদ বাবু তাঁহার বাসার নিকট একটা রুদ্রাক্ষ গাছের তলায় বসিয়া গুরুদেব গুরুদেব করিতে ছিলেন। আমরা নিকটে যাইয়া ডাকিলাম "বিনোদ বাবু" বিনোদ বাবু সহসা চমকিত হইয়া আমাদের দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "আর ভাই বিনোদ বাবু ও তুচ্ছ পার্থিব নাম ভুলিয়া যাও। অহংজ্ঞানে মত্ত হইয়া কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে কেবলমাত্র সেই সত্যানন্দ চিন্ময়ের নাম ধ্যেয়।" এই বলিয়া তিনি আবার গুরুদেব গুরুদেব আরম্ভ করিলেন।

আমি এবার সজোরে ডাকিলাম "বিনোদ বাবু"—

বিনোদ বাবু কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন "কি ভাই" ?

আমি বলিলাম "বিনোদ বাবু আমরা আপনার যোগশিক্ষার কথা শুনিয়া এবং তৎ সম্বন্ধে সত্যাসত্য জানিতে ইচ্ছা করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।" বিনোদ বাবু বলিলেন "ভাই তোমরা কি আমার সব কথা বিশ্বাস করিতে পারিবে ? এই গূঢ় তত্ত্বের কথা আলোচনা করিলে তোমাদের নিকট মিথ্যা গল্পের মত বোধ হইবে। অতএব এ সম্বন্ধে তোমার—" অতুল বাধা দিয়া বলিল "না বিনোদ বাবু এ সম্বন্ধে অমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তবে যোগেন সহজে এতে বিশ্বাস করিতে চায় না, তাই আপনার নিকটে আসা।"

আমি একটু লজ্জিত হইয়া বলিলাম "না বিনোদ বাবু আপনি আমাকে এতটা বেয়ারা বলিয়া মনে করিবেন না। তবে কিনা অতুল আমাকে মোটেই বুঝাইয়া বলিতে পারিল না।"

বিনোদ বাবু। না তাতে আমি কিছুই মনে করি না। তবে কোন বিষয়ে সম্যক ভাবে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা না

করিয়া অগ্রাহ্য করা আজকালকার ছেলেদের একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তা যা' হউক তোমরা যখন জানিবার অভিপ্রায়েই আসিয়াছ তখন এ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিনোদ বাবু গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। আমরা কৌতূহলী হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। বিনোদ বাবু বলিতে লাগিলেন "প্রথম যখন আমি গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করি তখন তিনি আমার আপাদমস্তক ভালরূপ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "হঁা তুমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে বটে।" তখন আমি মনোভাব ব্যক্ত করিলাম। গুরুদেব বলিলেন সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না, আমি তিন দিনের মধ্যেই তোমার মনোমধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করিয়া তুলিব এবং তদ্দ্বারা অন্যান্য চিন্তা দূর হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইবে। তারপর যোগাসনে বসিয়া আমাকে ভাবিলেই কিয়ৎকাল মধ্যে তোমার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইবে এবং আমাকে পরিস্ফুট ভাবে দেখিতে পাইবে। সেই অবস্থায় তুমি যাহাই আমার নিকট জানিতে চাহিবে, যতই দুর্ব্বোধ্য হউক না কেন অতি সহজেই বুঝিতে পারিবে। আমরা (সাগ্রহে) বলিলাম "তারপর"।

বিনোদ বাবু। তার পর তিনি তিন বৎসরের জন্য সংযম ও এই রূপ ধ্যান ধারণার আদেশ করিলেন। আমি তদনুসারে প্রায় তিনটী বৎসর অতিবাহিত করিতে চলিলাম। প্রথম বৎসর অনেকটা কষ্ট বোধ হইল। দ্বিতীয় বৎসর সহ্য হইয়া আসিল। এখন আর কষ্ট বোধ হয় না বরং সমাধি অবস্থায় অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিয়া থাকি।

আমি। তা'হলে আপনার শিক্ষা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

বিনোদ বাবু। হঁা গুরুদেবের কৃপায় অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া মনে হয়।

বলিলেন সমস্তই আমার সঙ্গে বেশ মিলিয়া গেল। অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অতুল বলিল "এরই নাম যোগবল।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়।

দীক্ষা

ও মোর মৌন দেবতা !
আজিকে আমার ক্ষুব্ধ এ হিয়া
আকুলি, ব্যাকুলি, উঠিছে কাঁদিয়া
তারে তুমি আজি করহে শান্ত
ঝটিকার পরে যথা প্রশান্ত * ;
ক্ষুধিত, ব্যথিত, চঞ্চল চিত্তে
বয়ে যাক্ নীরবতা !
নীরবে আজিকে ভ'রে যাক প্রাণে
তোমারি নীরব—গাঁথা।

হে মোর নীরব স্বামি !
এ বিশ্ব হ'তে লও মোরে দূরে
হোথা ওই তব নীরবতা পারে ;
হোক্ এ হৃদের মোহ অবসান
সব সুখ, দুঃখ, মান, অভিমান ;
উঠুক্ পরাণে শুধুরে বাজিয়া
তোমার নীরব রাগিণী
ঘুচুক হিয়ার শ্রান্তি ক্লান্তি
হইব তোমারি ধেয়ানী।

শ্রীব্রজেন্দ্রলাল সরকার।

---

* প্রশান্ত মহাসাগর !

চিত্রা

উপক্রমণিকা—

মালদ্বীপের রাজা আনন্দমোহন; তাহার অতুল বৈভব। এক-মাত্র মাতৃহারা মেয়ে তাঁর চিত্রা। চিত্রা বড় সুন্দরী; তাহার বয়স এখন প্রায় পনেরো বৎসর। কাশ্মীর রাজকুমার অমিয়ভূষণ এক-দিন শিকারে আসিয়া হঠাৎ রাজকুমারীকে দেখেন ও উন্মত্ত প্রায় হন। তাঁহার পিতা কোনক্রমে এই কথা জানিতে পারিয়া রাজা আনন্দমোহনের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূত মালদ্বীপে পৌঁছিয়া তত্রত্য রাজাকে সমস্ত জানাইলেন।

১

সুরম্য উদ্যান মধ্যে রাজকুমারী চিত্রার বসত বাটী; একটি সুসজ্জিত কক্ষে চিত্রা বসিয়া আছে; সখিগণ তাহার কেশ বিন্যাস করিয়া দিতেছে এমন সময় আর একজন সখী হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, ভাই, শুনেছ তোমার বিয়ে?

রাজকুমারী। কার!—

সখী। তোমার লো তোমার; কাশ্মীর রাজকুমার নাকি শিকার করিতে আসিয়াছিলেন; তারপর তিনি তোমায় কেমন করিয়া দেখেন। সেই অবধি রাজকুমার একেবারে পাগলের মত হইয়া গিয়াছেন। তাই তাঁর পিতা মহারাজের নিকট দূত পাঠাইয়াছেন।

রাজকুমারী কোন কথা না বলিয়া নতোবদনে চিন্তা করিতে লাগিল। একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—রাজা আনন্দমোহন কন্যার শিক্ষার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। চিত্রাও উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিল।

রাজকুমারীকে চিন্তিতা দেখিয়া সখী বলিল, কি ভাই চুপ করিয়া রহিলে যে?

রাজ কু। আমি বিবাহ করিব না।

সখী। বিবাহ করিবে না কি রকম ?

রাজ কু। কেন, তুমি কি জান না যে বিবাহ হইলেই আমরা পুরুষের ক্রীতদাসী হইয়া পড়ি। স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিবার ক্ষমতা থাকে না। আমাদিগকে সর্ব্বদা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে থাকিতে আমাদের মনোবৃত্তিগুলিও সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় ও ক্রমে ক্রমে নিজেরাও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ি। না, আমি বিবাহ করিব না। কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রালাপে এ জীবন অতিবাহিত করিব। আমি আজই পিতাকে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করাইয়া দিতে বলিব। তোমাদের যদি ইচ্ছা হয় তবে তোমারও আমার সহিত তথায় শিক্ষালাভ করিও। এই কথা শুনিয়া সকলেই প্রথমে অস্বীকার করিল; কিন্তু রাজকুমারী ছাড়িবার পাত্রী নহে ; সুতরাং সকলকে পরে মত দিতে হইল। চিত্রা সেই দিনেই তাহার পিতার নিকট সমস্ত বলিল। এই কথা শুনিয়া রাজা আনন্দমোহন অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; কন্যাকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন কিন্তু কিছুতেই চিত্রার মন টলিল না। তখন আর তিনি কি করেন—(চিত্রা তাঁর একমাত্র মেয়ে; বড় স্নেহের সামগ্রী) একটি বিদ্যালয় প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। রাজকুমারী সহচরীগণের সহিত তথায় শাস্ত্রালাপে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিল।

২

কাশ্মীর রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষমধ্যে কুমার অমিয়ভূষণ বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন এমন সময় তাঁহার একজন সহচর সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কুমার বলিলেন, খবর কি ?

সহচর। দূত ফিরিয়া আসিয়াছে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। রাজকুমারী নাকি বিবাহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন

ও একটী কুমারী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তথায় সহচরীগণের সহিত শাস্ত্রালাপনে কাল অতিবাহিত করিতেছেন। ইহা শুনিয়া কুমার অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন, চিত্রা বিবাহ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহা হইলে আমার কি হইবে? আমি তাহাকে না পাইলে বাঁচিব না।

সহচর। তাহা হইলে কি করা যায়?

অমিয়। আমিও ও কিছু ভাবিয়া পাইতেছি না।

সহচর। মহারাজকে বলিয়া মালদ্বীপ আক্রমণ করিয়া রাজকুমারীকে বন্দিনী করিয়া আনিয়া পরে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিলে কিরূপ হয়?

অমিয়। আমি ওরূপ নীচমনা নহি যে একজনকে বল প্রকাশে বিবাহ করিব।

সহচর। আর তো উপায় খুঁজিয়া পাইতেছি না।

অমিয়। আমি ছদ্মবেশে তথায় গিয়া কুমারী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইব, তাহা হইলেও ত তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইব। তারপর একদিন সুবিধা মত তাহাকে সমস্ত কথা জানাইব।

সহচর। ইহা যেন করিলেন কিন্তু যদি ধরা পড়িয়া যান?

অমিয়। খুব সম্ভব আমি ধরা পড়িব না আর তুমি ত জানই আমি ছদ্মবেশ ধরিতে কিরূপ নিপুণ।

সত্যই কুমার ছদ্মবেশ ধারণে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার অতি সুন্দর চেহারা—অনেকটা মেয়ে লোকের মত আর তাঁহার এখনও গোঁফ দাড়ির রেখা উঠে নাই। অবশেষে এইরূপ পরামর্শই স্থির হইল ও কয়েক দিন পরে তাঁহার সহচরটীকে লইয়া অমিয়ভূষণ মালদ্বীপে চলিয়া গেলেন।

৩

কুমারী বিদ্যালয়ের উদ্যান বাটীকার মধ্যে রাজকুমারী চিত্রা

বসিয়া আছে। তাহার হস্তে একখানি পুস্তক। একটি কিঙ্করী আসিয়া বলিল, "একটী মেয়ে আপনার সহিত দেখা করিতে চায়।"

চিত্রা। তাহাকে এইখানে লইয়া আইস। কিয়ৎক্ষণ পরে দাসী একটী পরমাসুন্দরী যুবতীকে লইয়া আসিল। রাজকুমারী তাহাকে বসিতে বলিলে যুবতী উপবেশন করিলেন। তখন রাজ-কুমারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?

যুবতী। আমি কলিঙ্গ হইতে আসিয়াছি। আমার পিতা কলিঙ্গের একজন সামন্ত। আমার নাম চপলা।

চিত্রা। তোমার এখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

যুবতী। কুমারী বিদ্যালয়ের নাম শুনিয়া এখানে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিয়াছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আপনাদের সঙ্গিনী করিয়া লন তাহা হইলে বড়ই বাধিত হইব। চিত্রা একজন পরি-চারিকাকে ডাকিয়া বলিল. এঁর নাম চপলা ইনি এইখানে থাকিবেন। ইঁহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দাও। বলা বাহুল্য চপলা ছদ্মবেশী কুমার অমিয়ভূষণ।

চিত্রার সহিত চপলার দিন দিন প্রণয় বাড়িতে লাগিল ও কিছু দিন পরে তিনি চিত্রার প্রধানা সখী হইলেন। শেষে এমন হইল যে চিত্রা চপলাকে ছাড়িয়া একদণ্ডও থাকিতে পারে না। কুমার প্রায় প্রত্যহ রজনীতে সহচরের নিকট যাইতেন ও পিতা মাতার সংবাদাদি জানিতেন। একদিন রাত্রে চিত্রা একটী স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পায় ও অমিয় ভূষণকে ডাকে কিন্তু কোনও উত্তর না পাওয়ায় তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিল. কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার মনে দারুণ সন্দেহ হইল ও অন্যান্য শিক্ষার্থিণী দিগকে ডাকিয়া লইয়া অমিয়ভূষণের ঘরে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে অমিয়ভূষণ নিজ বেশে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চিত্রা প্রথম

বড়ই ভীতা হইল ও পরে চিনিতে পারিয়া বলিল, কে তুই ছদ্মবেশে এখানে আসিয়াছিস, তোর মৎলব কি? অমিয়ভূষণ যখন দেখিলেন যে তিনি ধরা পড়িয়াছেন তখন তিনি চিত্রার নিকট সমস্ত বলিলেন। ক্রুদ্ধা চিত্রা তাহার পিতাকে সমস্ত বলিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে আনন্দমোহন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ও অমিয়ভূষণকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

কুমার অমিয়ভূষণের সহচর কাশ্মীরে গিয়া তত্রত্য রাজাকে সমস্ত বলিল। একমাত্র পুত্র বন্দী। ইহা শুনিয়া তিনি ক্রোধে অগ্নিপ্রায় হইলেন ও সেই দিনই বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া মালদ্বীপাভিমুখে গমন করিলেন, ও মালদ্বীপের সন্নিকটে আসিরা আনন্দমোহনের নিকট দূত পাঠাইয়া দিলেন। দূত মালদ্বীপ রাজসভায় আসিয়া বলিল মহারাজ, কাশ্মীর রাজকুমার আপনার বন্দী, তাহাকে অবিলম্বে মুক্ত করুন নতুবা কাশ্মীররাজ সসৈন্য আসিয়া আপনাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবেন। তিনি নিকটেই সসৈন্য অবস্থান করিতেছেন আমি তাঁহার দূত। আনন্দমোহন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, তিনি যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

৪

রজনী ঘোর অন্ধকারাবৃতা। মালদ্বীপের অনতিদূরে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে। চারিদিকে রক্তের নদী; আহতের আর্ত্তনাদ ও যোদ্ধৃগণের হুঙ্কার রবে পুর্ণ। মালদ্বীপের দুর্গ মধ্যে যে কক্ষে কুমার অমিয়ভূষণ বন্দী সেই কক্ষদ্বারে একজন প্রহরী অস্ত্র হস্তে পাহারায় নিযুক্ত। কুমার যুদ্ধের সংবাদ পাইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি পলায়নের কৌশল উদ্ভাবনে নিমগ্ন। হঠাৎ তিনি দরজার নিকটে গেলেন ও সর্প দংশন করিয়াছে বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; চীৎকার শুনিয়া প্রহরী দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া যেমনই গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল অমনি কুমার সিংহ-

বিক্রমে তাহার উপর পতিত হইয়া হস্তদ্বারা তাহার গলদেশ নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। প্রহরীর আর চীৎকার করিরার অবসরও হইল না; মৃতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। কুমার সত্বরে প্রহরীর হস্ত পদ বন্ধন করিলেন। চীৎকার করিতে না পারে এইজন্য তাহার মুখও বাঁধিলেন। তারপর প্রহরীর পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন ও অস্ত্র হস্তে দুর্গের বাহিরে আসিলেন। এবং সেই রাত্রেই পিতার শিবিরের উদ্দেশে পলায়ন করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত সহচরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সহচর কুমারের পলায়নের কৌশল শুনিয়া আহ্লাদিত হইল। কুমার কহিলেন দেখ যে জন্য যুদ্ধ তাহা ত হইল তবে আর বৃথা রক্তপাতের আবশ্যক কি! চল পিতার নিকটে যাই। এই বলিয়া দুইজনে কাশ্মীররাজশিবিরামুখে চলিলেন তাঁহারা প্রায় শিবিরের নিকট আসিয়াছেন এমন সময় একজন কাশ্মীর সৈন্য তাঁহাকে মালদ্বীপসৈন্য ভাবিয়া গুপ্তভাবে অস্ত্রাঘাত করিল। অস্ত্রাঘাতে রাজকুমার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। সহচর চীৎকার করিয়া বলিল, হতভাগা করিলি কি। ইনি যে আমাদের রাজকুমার এই মাত্র কৌশলে মুক্ত হইয়াছেন। সৈনিক ভয়ে আত্মহারা হইল; সহচরের আজ্ঞায় নিকটবর্ত্তী কোনও নির্ঝর হইতে জল আনিতে গেল। সহচর দেখিল অমিয়ভূষণের স্কন্ধে আঘাত লাগিয়াছে। আঘাত সাংঘাতিক। সৈনিক জল লইয়া আসিলে প্রথমে তাহার মুর্চ্ছা ভঙ্গের চেষ্টা করিল কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। তারপর তাহারা দুইজনে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া কাশ্মীর রাজের নিকট লইয়া গেল এবং সমস্ত খুলিয়া বলিল। এমন সময় একজন প্রহরীর সহিত মালদ্বীপ রাজ্যের একজন দূত প্রবেশ করিল এবং অভিবাদন পুর্ব্বক মহারাজের হস্তে একখান লিপি প্রদান করিল। পত্র পাট করিয়া কাশ্মীর রাজ মন্ত্রী ও সেনাপতিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যুদ্ধে আগমনকালে কাশ্মীররাজ সঙ্গে কয়েকজন

ভিষক আনিয়াছিলেন। কুমারের চিকিৎসার নিমিত্ত প্রধান ভিষকের নিকট লোক প্রেরিত হইল।

মন্ত্রী ও সেনাপতি আসিলে পর কাশ্মীররাজ তাহাদিগকে বলিলেন আমার পুত্র কৌশলে মুক্তিলাভ করিয়াছে; কিন্তু আমাদের একজন সৈনিক চিনিতে না পারিয়া তাহাকে অস্ত্রাঘাত করে। বর্ত্তমান কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণার্থ আপনাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছি। যাহা হয় বিবেচনা করুন। এমন সময় ভিষক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাশ্মীররাজ ভীষককে বলিলেন শিবিরাভ্যন্তরে কুমার আছে তাহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। ভিষক চলিয়া গেলেন। তারপর কাশ্মীররাজ মন্ত্রী ও সেনাপতিকে বলিলেন আনন্দমোহন এখন আমাদের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা চায়। সেই মর্ম্মে বাহক দ্বারা একখানি লিপি প্রেরণ করিয়াছেন। যে জন্য যুদ্ধ করা তাহাত প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে তবে বিধাতা যদি বিমুখ হন। সেনাপতিকে বলিলেন আপনি যুদ্ধভঙ্গের আদেশ প্রদান করুন, আর যুদ্ধের আবশ্যক নাই।

৫

মালদ্বীপ রাজপ্রাসাদের একটী নিভৃত কক্ষে কুমার অমিয়ভূষণ রুগ্ন শয্যায় শায়িত। রাজকুমারী চিত্রা তাঁহার শুশ্রুষায় ব্যাপৃতা। মালদ্বীপের রাজা কাশ্মীর রাজার সহিত সন্ধি করিয়াছেন। তাঁহাদের ভিতর আর কোনও বিদ্বেষ নাই; এখন তাঁহারা পরস্পর বন্ধুত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ। রাজকুমার যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাত পাইয়া যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন এখনও তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। চিকিৎসক বলিয়া গিয়াছেন যে আজ কুমারের চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা তাই চিত্রা আজ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত অমিভূষণের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার মন যেন আজকাল কিরূপ হইয়া গিয়াছে। অমিয়ভূষণের দিকে চাহিয়া থাকিলে আর চক্ষু ফিরাইতে পারে না।

সে কোন দিনও ভালবাসা কি, স্নেহ কি বুঝিত না। আজকাল সর্ব্বদা রাজকুমারের নিকট থাকিতে থাকিতে তাহার উপর যেন কেমন একটা মায়া জন্মিয়া গিয়াছে। তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় আর একটু বসিয়া থাকে। ইহাই হয়ত ভাল বাসার পূর্ব্বাভাষ।

চিত্রা একদৃষ্টে অমিয়ভূষণের মুখের দিকে চাহিয়া আছে এমন সময় হঠাৎ যেন রাজকুমারের ঠোঁট নড়িয়া উঠিল। কি যেন বলিতে চাহিতেছেন। রাজকুমারী অনিমেষ নয়নে তাহার ওষ্ঠবিলোড়ন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে রাজকুমার চক্ষু খুলিলেন; চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি চিত্রার দিকে ফিরিল। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, চিত্রা আমি কি আবার বন্দী হইয়াছি। চিত্রা আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার প্রাণের উৎস খুলিয়া গেল। চিত্রা কাঁদিল শেষে সমস্ত বলিয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। অমিয় ভুষণের মুখ প্রফুল্ল হইল, সস্নেহবচনে চিত্রাকে বলিলেন, এতদিনে তোমার মন ফিরিয়াছে। চিত্রা লজ্জায় অধোবদনা হইল।

তারপর—পাটক পাঠিকারা অনুমান করিয়া লউন।

শ্রীভবানীপ্রসন্ন তালুকদার।

ঝটীকাপ্রিয়

একটী বিহঙ্গের প্রতি।

(অনুবাদ)

(১)

সমুদ্রের বক্ষোপরি হুহুঙ্কার রবে
ক্রোধান্বিত ধায় যবে উত্তরের বায়,
উদ্বেলিত ঊর্ম্মিমাঝে কম্পমান যবে
সিন্ধুযান ধীরে ধীরে নাস্তিত্বে মিশায়
কে তুমি গো তুচ্ছ পাখি মত্ত উল্লাসে।
ঝঞ্ঝাসনে ঘোষ রণ ক্ষিপ্ত সাহসে।

(২)

তব লাগি নহে পাখি সেই গন্ধবাহী
মৃদুমন্দ সমীরণ ফলোদ্যান মাঝে
ভ্রমর গুঞ্জন কিংবা থাইমি কুঞ্জবনে।
সুমধুর বীণাসম তব কর্ণে বাজে,
উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গের গম্ভীর গর্জ্জন ;
ঊর্ম্মিপরি নৃত্যকারী ক্ষুব্ধ প্রভঞ্জন।

(৩)

মহার্ণবপোত যবে ধ্বংসমুখে ধায়
ওগো চঞ্চল জলধির অঞ্চল সাথী,
কিরূপে সে ধ্বংশোপরি ক্রীড়া কর একা
মৃত্যু আর ঝঞ্ঝা সদা আনে তব প্রীতি,
হৃদয়ে মোদের করে ভীতির সঞ্চার।
হর্ষরাশি ঢেলে দেয় অন্তরে তোমার।

(৪)

হায় পাখি, ইচ্ছা করে পারিতাম যদি
চলিতে তোমার মত নির্ভয়ে অক্ষত
জীবনসংগ্রাম মাঝে ; প্রতি পরীক্ষায়
অবহেলি তুচ্ছ শঙ্কা বিঘ্ন লক্ষ শত
সহিতে তোমার মত ধীর অবয়বে,
জীবনের ঝঞ্ঝাগুলি একে একে সবে।

শ্রীজীতেন্দ্রনাথ সেন।

অনুশোচনা

গ্রীষ্মান্তে শীত, শীতান্তে গ্রীষ্ম। পুরাতনের উপাদানে নূতনের সৃষ্টি, নূতনের চরমে পুরাতন অবস্থা। করুণাময় জগৎস্রষ্টার সৃজিত এই নিয়ত ভ্রম্যমাণ ও পরিবর্ত্তনশীল জগতে প্রত্যেক বস্তুরই সর্ব্বদা এইরূপ অলৌকিক পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। মনুষ্যজ্ঞানাতীত অচিন্ত্যশক্তিশালী জগৎকর্ত্তার এই সকল আশ্চর্য্য বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে যাইয়া মানবের বুদ্ধি স্বতঃই পরাস্ত হইয়া তাহাদের চিন্তা হইতে প্রত্যাকৃষ্ট হইতে ইচ্ছা করে। তাহাদের শৃঙ্খলাই বা কি আশ্চর্য্যজনক! যেন সবই এক শৃঙ্খলা ও এক নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত। একটু চিন্তা করিয়া দেখ—দেখিতে পাইবে পার্থিব সমস্ত জীবজন্তু তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মপানে মহোৎসাহে ধাবিত, স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্যস্ত ; সকলেই একে অপরের নিকট বিধি নিয়োজিত কর্ম্মে নিযুক্ত। নশ্বর সংসারে কত জন কর্ম্মক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্ম্মবীজ বপন করিয়া তদুৎপন্ন সিদ্ধি ফলে চিরস্মরণীয় হইয়া যান। কিন্তু তোমার দিকে একবার দৃক্‌পাত কর—দেখিতে পাইবে কোন্ অন্ধকারময় অজ্ঞাতদেশে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছিলে। তৎপর

এই উজ্জ্বল, হিংসা, দ্বেষ, মায়া ও মমতা পূর্ণ এক নূতন অত্যদ্ভুত দেশে তুমি অবতীর্ণ। অদ্ভুত দেশটীই সংসার। পিতা মাতার কোলে সুখময় শৈশব কাল হেলায় কাটিয়া গেল। এখন এই সংসার নাট্যশালায় তোমাকে অভিনেতা সাজিতে হইবে। সুতরাং অবিলম্বেই প্রথম দৃশ্যের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলে। কর্ত্তব্যের গুরুভার বহনে অসমর্থ হইলেও প্রথমে নূতন উদ্যমে ও প্রত্যোৎসাহে কিয়ৎকাল সুচারুরূপে অভিনয় সম্পন্ন হইল। কিয়ৎকালের পর তোমার সৎ সংসর্গের মিলন; তীব্রতর হলাহলের ন্যায় অলক্ষিতে সেই সংসর্গ গুণ তোমার শরীরে বিসর্পিত হইল। মিথ্যাকথা, পরহিংসা, পর পীড়া, পরদ্বেষ ও অহঙ্কার প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি শীঘ্রই তোমার অন্তঃকরণে প্রস্ফুটিত হইল। তুমি পরের ছিদ্রানুসন্ধানে ব্যস্ত, পরের বিচারে রত ও যাহা আপাতো মনোরম সুখবিধাতা তাহারই লাভে লালায়িত। একটীবার ভ্রমেও মনে হয় না যে এই পাপরাশির বোঝা লইয়া এই সংসার হইতে মহাযাত্রা করিতে হইবে, অপরের তুলনা ও বিচারে তোমাকেও একবার ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বিধানকর্ত্তার নিকট তুলিত ও বিচারিত হইতে হইবে। তুমি এই সব পাপানুষ্ঠানে কি স্বার্থ লাভ করিলে ? এ পর্য্যন্ত জগতে কাহার উপকারে আসিয়াছ ? মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্যের কোন্‌টী সম্পন্ন করিলে ? তবে জগদীশ্বরের সৃজিত সংসারে তাঁহার সৃজিত জীব হইতে তুমি কি বিভিন্ন ? কিন্তু কর্ম্ম ফল ভোগ না করিয়া যাও কোথায় ? তুমি মনে কর দিন কয়টী হেলায় কাটিয়া দিব কিন্তু তা নয়! তুমি যে চিন্তারূপ তুষানলে দগ্ধ, যে কথা মনে উত্থাপন করিলে বর্ষাবারির ন্যায় তোমার অশ্রুধারা অনর্গল বহির্গত হয় ও যে সকল আশায় বঞ্চিত হইয়া তুমি অহরহঃ অনুশোচনা করিতেছ তাহা কাহার ফলে ? অনেক পুণ্যবলে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কঠোর তপস্যার ফলে এ দুর্লভ মানব জনম লাভ করিয়াছ। কিন্তু এমন মানব জনম লাভ করিয়া কি

করিলে ? শৈশবে ধূলা খেলায় ক্ষরপ্রবাহিত তরঙ্গপ্রায় দিনগুলি কাটিয়া গেল—দিনগুলি অতিবাহিত করিয়াছ তখন তারই জন্য আবার অনুতাপ। এখন ও একবার স্বকার্য্য সাধনে যত্নশীল হও। ভাবিয়া দেখ তোমাকে যে কি ভয়াবহ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। তবে তুমি কি সর্ব্বদা আপাতমধুর দ্রব্যের জন্য উন্মাদ হইয়া থাকিবে ? ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী পদার্থের জন্য লালায়িত হইবে ? ধিক্ তোমাকে ! শত ধিক্ ! যাহা নিত্য, শুদ্ধ, সত্য, শান্ত ও চিরস্থায়ী তাহার দিকে তুমি একটীবারও দৃক্‌পাত কর নাই। ভাল, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমিও ত এভব রঙ্গভূমের লীলা খেলা শেষ করিয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবে কিন্তু তুমি কি কিছু পথের সম্বল সঞ্চয় করিয়াছ ? তুমি জান না যে তোমার স্বদেশে যাত্রাকালীন কেহই তোমার পথের সহায় হইবে না। আগমন কালীন নগ্নাবস্থা হইলেও তোমার মুষ্টিবদ্ধ হস্তে যেন কি ছিল। কিন্তু প্রত্যাগমন কালীন তাহাও যে তোমার হস্তে থাকিবে না। তবে দুঃখিত হইও না। এখনও সময় আছে। চেষ্টা কর। পথের সম্বল অচিরেই সংগ্রহ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। যদি মানব হইয়া মানবের কর্ম্ম করিতে চাও তবে প্রথমতঃ দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি, প্রেম ও হিতাহিত জ্ঞান প্রভৃতি গুণাবলীতে অলঙ্কৃত হও। তোমার পাপাসক্ত হৃদয়ের আবিলভাব পরিত্যাগ কর। নিজের অকৃতকার্য্যের জন্য ঈশ্বরের পবিত্র নামে কলঙ্ক রটাইও না। কুপ্রবৃত্তি তোমার উন্নতির পরিপন্থী কুসংসর্গ তাহার নিদান। জগৎ পিতাকে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সদানুষ্ঠানে উদ্যোগী হও নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ করিবে। সৎকর্ম্মা ব্যক্তিই জগতে পদাঙ্ক স্থাপনপূর্ব্বক চিরস্মরণীয় হন ও উন্নতি লাভে সমর্থ হন। ইহা ধ্রুব সত্য।

শ্রীনলিনীকান্ত দাস।

অঞ্জলি

"আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র ন বারিণা শুদ্ধতি চান্তরাত্মা॥"

১ম বর্ষ } মাঘ, ফাল্গুন, ১৩২৪ { ২য়, ৩য় সংখ্যা।

বাণী

বহুদিন পরে আসিছেন মাতা
মোদের কুটীরে আজি ;
বাজ মৃদঙ্গ গম্ভীর রবে
উঠরে শঙ্খ বাজি।
কুঞ্জে কুঞ্জে বিহগ পুঞ্জ
বন্দনা গীতি গাও আনন্দে,
গাও সবে মিলি আজি জয় গান
নবীন কণ্ঠে নূতন ছন্দে।
অমল ধবল চরণ যুগল মরাল উপরে রাজে।
পদ্ম আসনে বসেছ জননি! বিমল মোহন সাজে।
শোভিছে গ্রন্থ অঙ্কের পরে
ঝঙ্কারে বীণা সুকোমল করে
চরণে শোভিত স্বর্ণ নূপুর রুনু ঝুনু রবে বাজে
একি অপরূপ বিমোহন রূপে দেখা দিলে হৃদি মাঝে ?

জয় বীণাপাণি জয়

তোর আহ্বান-গীতি গাহিয়া উঠিছে আজিকে পরাণ ময়

হৃদয় দেউলে পেতেছি আজিকে কনক-
আসন খানি

আশা পথ তব চাহিয়া জননি! বসিয়াছি
জুড়ি পাণি

হৃদয়ে আমার নাহিত সাধনা, কণ্ঠে
আমার নাহিত তান

শুধু ভক্তি-অশ্রু-সিক্ত পরাণ, করিব
তোমার চরণে দান

বাজুক আমার জীবনকুঞ্জে তোমার
রাগিণী দিবস রাতি

জ্বলুক আমার হৃদয়ে জননি! তোমারি
কৃপায় জ্ঞানের বাতি

চাহিনা কিছুই, করিনা কামনা;
সম্পদ, যশ, বিত্ত, মান

চাহি শুধু তব বচন-অমিয়
পরাণ ভরিয়া করিতে পান

জয় মা জননি রজত-বরণী তিমির-হারিণী
জয় মা বাণি

হৃদয়ে আজিকে বসি আনন্দে কণ্ঠে আমার
ফুটাও বাণী।

কল্পনা-কাননে যেতে সাধ মম
পুষ্প-চয়ন-কাজে

করুণা করি মা খোল আজি দ্বার
যাইব তাহারি মাঝে।

*　　*　　*　　*　　*

এস এস আজ মন্দির মাঝ
বাণীর ভকত যত
নত হও সবে, মায়ের সমুখে
পূজার ফুলের মত
কনক কলস ভরিয়া জননি
এনেছেরে সুধা করিতে দান
ভোল সবে আজি দুঃখ, দৈন্য
মহানন্দে তাহা করিয়া পান।

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে লিখিত।　　শ্রীধর শ্যামল

---

*যৌবন

বসন্তের সমাগমে বৃক্ষ ব্রততী যেমন নূতন প্রাণ লাভ করে সেইরূপ মানুষ যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেই এক অভিনব শ্রী ও শক্তি সমন্বিত হয়। মানব জীবনের স্রোত এক সম্পূর্ণরূপ নূতন ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে যেন একটি ক্ষুদ্র গিরিনির্ঝরিণী এক মহানদীর সহিত মিলিত হইল।

যৌবনে মানসীক ও দৈহিক সৌন্দর্য্যের এক অপূর্ব্ব বিকাশ। বসন্ত যেমন কুসুম ফুলের সুপ্ত সৌরভকে পুষ্প গর্ভ হইতে জাগাইয়া দেয়, যৌবনও সেইরূপ মানব হৃদয় নিহিত বিবিধ ও বিচিত্র ভাব নিচয়কে প্রস্ফুটিত ও জাগরিত করিয়া দেয় ফলতঃ, বিধাতা বিনা প্রার্থনায় মানবকে যে সমুদয় অমূল্য বর প্রদান করিয়াছেন যৌবন তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যৌবন মনুষ্য জীবনের সারভাগ। মধুময় জীবন চিরদিন থাকে

ইহা সকলেরই প্রার্থনা কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই যে গমনোন্মুখ যৌবনকে এক মুহূর্ত্তের জন্য ধরিয়া রাখে। জীবনের এই সরল বসন্তে নিতান্ত অরসিক লোকও কিয়ৎ পরিমাণে কবি হইয়া উঠে। যুবকের চক্ষে সমুদায়ই সুন্দর ও কাব্যময়।

যৌবনকালে মানবহৃদয়নিহিত যে সমুদয় উৎকট প্রবৃত্তির উদয় হয় তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিলে কি হইবে? চুল্লীর অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দিলে কি রন্ধনের সুবিধা হইবে? সুনিপুণ পাচক যেমন প্রত্যেক ভোজ্যদ্রব্য পাক করিতে যে পরিমাণে উত্তাপের প্রয়োজন সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখে; সেইরূপ যৌবনের উৎকট প্রকৃতি গুলিকে উন্মুলিত না করিয়া সংযত করিতে হইবে; সৎপথে চালিত করিতে হইবে। বেগগামী অশ্বের পা ভাঙ্গিয়া দিলে কি হইবে? রশ্মি সংযত করিয়া তাহাকে উপযুক্ত পথে এরূপভাবে চালিত করিতে হইবে যেন তাহার অভিলষিত বেগের হ্রাস হয়।

সুখ অবহেলার বস্তু নহে। সুখ পবিত্র ও দৈব। এই মধুময় যৌবনে সুখের তার সপ্তমে চড়াও। এই সুন্দর জগতকে প্রাণ ভরিয়া ভোগ দখল করিয়া লও। একটী বানোচ্ছাস একটি বৃক্ষ পত্রের কম্পনও যেন চলিয়া না যায়। কিন্তু সাবধান, সুখকে যৌবন তরীর কর্ণধার করিয়া যেন দিব্যজ্ঞানে জলাঞ্জলি না দাও, সাবধান যেন উন্মত্ত ভ্রমরের ন্যায় কেতকী মধু আহরণ করিতে ছিন্ন পক্ষ না হও। সাবধান যেন সুধা ভ্রমে হলাহল পান করিও না। যে আমোদ সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানানুমোদিত ও নীতি সম্মত সেই আমোদই আমোদ, আর যে আমোদ সাধুতা বিগর্হিত ও নীতিবিরুদ্ধ যে আমোদ স্বাস্থ্য নাশ করে ও অধঃপতনের দ্বার খুলিয়া দেয় উহা আমোদই নহে।

যৌবন কাহারও জীবনে একবার বই দুইবার দেখা দেয় না। এই রঙ্গের তাস যখন একবার হাতে পাইয়াছ বিশেষ বিবেচনা করিয়া

খেলিও। এখন খেলায় ভুল করিলে পরিণামে পরিতাপই সার হইবে।

এইবেলা যত পার গোলাপের কুঁড়ী সংগ্রহ করিয়া ভাল গাঁজিপুরী আতর প্রস্তুত করিয়া লও। এই মাহেন্দ্রক্ষণের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের উপর তোমার ভাবী জীবনের সারবর্ত্তা নির্ভর করিতেছে—তাই কবি বলিয়াছেন।

"ন সদগুণান্ যো বিভর্ত্তি যৌবনে
ন বার্দ্ধক্যে তেন সুখং হি লভ্যতে
মধ্যে ন ধাত্তে মুকুলানি অগুরুঃ
স কিং নিদাঘে পরিশোভতে ফলৈঃ।"

ইতি চাণক্য শ্লোকম্।
৭৮।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যৌবনে সদগুণশালী না হয় সে বার্দ্ধক্যে সুখলাভ করিতে পারে না। যে বসন্তকালে মুকুলোদ্গম্ হয় না সে কি কখনও গ্রীষ্মকালে ফল শোভিত হয় ?

ভক্তি।

কে তুমি জননি, জ্যোতির্ব্বরণি, শ্বেত-মর্ম্মর-আসনা,
জাগাও আমার, অন্তর তলে, পুণ্য অমল বাসনা।
অযুত পথের, অযুত কিরণ, বরষি অযুত ধারা,—
কি মহা হর্ষ, পুলকে ভাসাও, ছুটাও প্রীতির ফোয়ারা।
না জানি কি বীণায় বাঁধিয়াছ সুর ঝঙ্কারি উঠিছে তান ;
না জানি কি মন্ত্রে, মুগ্ধ সকলে, করিছে তোমার গান।

---

* ১৯১৫ সালে কোচবিহার সারস্বত সমিতি হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত।
Victoria College Saraswati Puza 1917.

বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণু, কুসুম কোরকে, মুকুলে,
অম্বর পরে, পাষাণের শিরে, সুনীল সিন্ধু সলিলে ;
অরুণের রাগে, জলদ মালায়, কল্লোলিনীর কল্লোলে ;—
দেখি মা তোমার, চরণ রেখা অঙ্কিত, সর্ব্বব্যাপিনী
লুব্ধ এ হিয়া, বিপুল পুলকে, শিহরে দিবস যামিনী !
তাইতে ক্ষুদ্র হৃদয়ে, তোমার উচ্ছ্বাস কণা মাখিয়া
নীরবে ছুটেছি, জীবনের পথে, তোমারই পানে চাহিয়া।

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়।

সান্ধ্য-আরাত্রিক

সন্ধ্যা হইয়াছে। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন ; তাই এক্ষণ বিশ্রামার্থ অস্তাচল চূড়ায় আরোহণ করিয়াছেন, আকাশ লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। দেখিয়া বোধ হয় কে যেন আকাশে রক্তচন্দন ঢালিয়া দিয়াছে। গোমহিষাদি দিবাশেষে গৃহে ফিরিতেছে—পশ্চাতে রাখাল বালকগণ কেহ বা গল্প করিতে করিতে কেহ বা তালহীন—অথচ সরল—মধুর পবিত্র ও শান্তিদায়ক গীত গাইতে গাইতে গৃহে ফিরিতেছে। শ্রম-ক্লান্ত কৃষকগণ বিশ্রামার্থ স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। গৃহস্থদের ঘরে ঘরে কুলবালাগণ ধূনা জ্বালাইয়া সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালিতেছে। সন্ধ্যার প্রিয় সহচরী তমসা ক্রমে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে ধরণী ঘোর অন্ধকারময়ী হইয়া উঠিল। প্রকৃতি ক্রমে নীরব নিবিড় হইতে লাগিল। এমন সময় গ্রাম্য দেবালয়ে দিগন্ত কাঁপাইয়া কাসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বাজিয়া উঠিল—কিন্তু তাহাতে

প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ হইল না—বরং আরও বর্দ্ধিত হইল। এ শব্দের মধ্যে কি যেন কি এক ভাব মিশ্রিত রহিয়াছে যাহা প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ না করিয়া বরং বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। এশব্দে ভক্তের প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যায়—বালকের প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে পাপীর হৃদয়েও এক নব ভাবের উদয় হয়। সবার প্রাণ আরতি দর্শনে উৎসুক হইয়া উঠে; তাই পবিত্রতার আনন্দ উপভোগ করিবার মানসে পরম পবিত্রতার আধার দেবালয়ে সান্ধ্য আরতি দর্শন করিবার নিমিত্ত মহা উৎসাহে সম্মিলিত হয়।

তাই যখন দেবালয়ে কাসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল তখন আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা পাপী, তাপী, জ্ঞানী সেই সঙ্গেসঙ্গে এই অধমও সেই দেবালয়ে চলিল, আমরা সেখানে গিয়া এক দৃষ্টে ও এক মনে সান্ধ্য আরতি দর্শন করিতে লাগিলাম ; দেখিলাম পুরোহিত মহাশয় নানা প্রকার হস্ত ভঙ্গি করিয়া আরতি করিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে শত কণ্ঠে দেবতার সুধাময় নাম ধ্বনিত হইতেছে, কেহ গাইতেছে কেহ দেবতার নাম যপ করিতেছে আবার কেহ কেহ বা পুত্তুলিকাবৎ দণ্ডায়মান্ ভাবে বিভোর এক মনে সান্ধ্য আরাত্রিক দর্শন করিতেছে আমিও এক মনে একদৃষ্টে আরাত্রিক দেখিতে লাগিলাম। সেই সময় কত কথা যে মনে পড়িল তাহার আর অন্ত নাই। কত ধর্ম্ম মীমাংসা কত সদিচ্ছা কত ভক্তির কথা যে হৃদয়ে জাগরূক হইল তাহার আর অন্ত নাই। আমি এইরূপ ভাবিতেছি মনে মনে মনের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেছে, এমন সময় কাসর ঘণ্টা একবার খুব জোরে বাজিয়া থামিয়া গেল। দেখিলাম সকলে প্রণাম করিতেছে, আমিও প্রণাম করিলাম।

আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে সকলে স্বস্ব গন্তব্য পথ ধরিতেছে। প্রাঙ্গনে হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি বাধিয়া গিয়াছে ; সবাই এখন ব্যস্ত সবাই এখন বিদায় সম্ভাষণ করিতেছে-

এ সম্ভাষণ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য ক্রমেই বর্দ্ধিত করিতে লাগিল, তাই এ কোলাহল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ।

আমিও তখন গৃহে ফিরিলাম এই দৃশ্য দেখিয়া পথে সেই এক দিনের কথা মনে পড়িল যে দিন আত্মীয় স্বজনদিগের নিকট হইতে এইরূপ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বিদায় লইয়া আপন গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতে হইবে।

এ জগতে দেখিতেছি কেবল বিদায় কেবল বিদায় আর সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছেদ ক্রন্দন। এর মধ্যেত শান্তি নাই। তবে কি এ জগতে শান্তি মিলেনা? মিলে বৈ কি।

যাহারা এ জগতে একমাত্র ভগবানে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা পার্থিব কোন ঘটনাতেই আলোড়িত হয়েন না। তাঁহারা সকল সময় সকল অবস্থায় তাঁহাদের আরাধ্য দেবতার অধিষ্ঠান তাঁহাদের হৃদয়ে দেখিতে পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করেন। ভগবান হইতে তাঁহারা অবিচ্ছিন্ন; কেহই তাঁহাদের কোন প্রকার অশান্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে। জড় জগৎ সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের অধীন। হে সংসারক্লিষ্ট জীবগণ! এই মায়াবহুল জগতে শান্তি পাইবার বাসনা থাকিলে মহামুনি প্রদর্শিত পথ অনুসরণ কর এবং এক মনে ভগবানে আত্মসমর্পণ কর। জড়জগতে কোন প্রকার বিদায়েই কোনদিন ক্লেশ পাইবে না, ইহাই সনাতন প্রথা—

দাস।

দুর্দ্দশা।

১।

জলদে ঢেকেছে অবনীর কায়া

দ্বিতীয় প্রহর রাতি

চঞ্চলা চপলা অধীরা হইয়া
জ্বালিছে আশার বাতি
গভীর নিস্বনে অবণী মণ্ডল,
চমকি উঠিছে ক্ষণেকে কেবল
আবার চপলা হেলিয়া দুলিয়া
খুলিছে জলদ দ্বার
পুণ্য লুকাইছে বদন মণ্ডল
কেবা মন বোঝে তার।

২।

স্রোতস্বিনী যদি ছুটিয়া সামনে
গিরি দেখিবারে পায়
মহা শব্দ করি যুঝি তার সনে
শেষে নিজ পথে ধায়
সেরূপ এখন ধীর সমীরণ
ধারণ করেছে আকৃতি ভীষণ
ভীষণ ভাবে দলি মহীরুহে
ধরণীর মাঝে ফেলিছে
আবার সবেগে হু হু শব্দ করি
গন্তব্য পথে চলিছে।

৩।

চপলা সুন্দরী অম্বুদমাঝে
মুহূর্ত্ত দেখায়ে সুখ
সুমধুর স্বরে হাসিছে কেবল
দেখিয়া পাপীর দুঃখ
পাপীদের দুঃখে ব্যথা বোধ করি
কুমুদিনী নাথ বদন আবরি

হরিণের রথে আপনার মনে
ভাবিছেন বসি তাই
পাপীদের ব্যথা দূর করে আজি
হেন কি কেহই নাই।

৪।

কেবল দূরে ; দূর দূরান্তরে
উঠিছে ভীষণ ধ্বনি
গভীর ঘর্ঘরে, ভীম হুঙ্কারে
পড়িছে কত অশনি
মৃত্যু বিভীষিকা হেরে নরগণ
করিতেছে ভয়ে চীৎকার ভীষণ
সুনীল অম্বর বিদারিয়া যেন
জ্বলন্ত গোলার মত
বিদীর্ণ করিয়া ধরণীর বক্ষ
অশনি পড়িছে কত।

৫।

হায় মর্ম্ম স্পর্শী! হাহাকার ধ্বনি
উঠিছে চৌদিকে কত
আবার মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া
যাইছে জনম মত
মৃত্যু দূত আজি ভীম বেশ ধরি
আসিছে নাশিতে মহাপাপী অরি
করাল বদন করিয়া বিস্তার
আসিছে যাহার দ্বারে
অমনি অভাগা, আতঙ্কে শিহরি
চলিছে পর পারে।

৬।

বিবাদ সাগরে মগন মানব
ভাবিছে বসিয়া সবে
"এ ভীষণ দিন হয়নি কখন
বুঝি বা প্রলয় হ'বে"
কিবা দোষে দোষী আজি নরগণ
কি পাপে পাইছে এ শাস্তি ভীষণ
কেন বিশ্বপতি ক্রোধান্বিত এত
দুর্ব্বল মানব পরে ?
"বুছি নরগণ এ শাস্তি পাইছে
কর্ত্তব্য ত্রুটির তরে।"

শ্রীজ্ঞানেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

হারানো

১।

"দাদা!"

"দিদি।"

"একটা কথা বলব ?"

"বল—দেখত ! এমনি করে কি পিঠের উপড় পড়ে ? এখনি ভাতের উপড় প'ড়তাম, ডিমটাও হাত থেকে পড়ে গেল।"

"বলবিনে ? দাদা।"

"আচ্ছা বল বল, গলাটা ছেড়ে দে। ডিমে লবণ মাখি কি করে।"

চুপ।

"দাদা, ও দাদা বলবি নে !"

"আঃ বিরক্ত করিস নি, কি বলব বল ?"

"আমি ঘুমুলে কেন তুই আমার মুখের দিকে চেয়ে কাঁদিস ?"

"যা যা, আগে খা গিয়ে।"

"না—আ, তুই না বললে আমি খাব না ;"

"আচ্ছা বস্ এসে পাগলী, বলছি।"

"না আগে বল।"

"কাঁদি এই জন্য, এ সংসারে তুই আমার আমি তোর, আমাদের কেউ নেই। আমি মলে তোর কি হবে তাই কাঁদি।"—স্বর দুঃখ ব্যঞ্জক।

"কিন্তু—"

"আর কিন্তু টিন্তু ছাড়, খাগে যাঃ।"

দাদা পাখার বাতাস করিতে লাগিল, ছোট বোন খাইতে লাগিল। তার দাদা তার জন্য সকালে অতি যত্নে কলাইয়ের দাল ও ডিম সিদ্ধ দিয়া ভাত রাঁধিয়াছে। দাদা অতি যত্নে খাওয়াইল, ছোট বোন খাইল। পরে, হাত মুখ ধোয়াইয়া, তাহা অতি আদরে আঁচল দিয়া মুছিয়া দিয়া হাত ধরিয়া পাশের বাড়ীর জেঠাইমার হাতে, অন্ধের লাঠি, গরীবের মানিকের মত, অতি আদরের ছোট বোনটিকে সঁপিয়া দিল। বলিল "দেখ জেঠাইমা, ওকে একলা কোথাও ছেড়ে দিও না" যেন কত যুগযুগান্তের বেদনারাশী পূর্ণ ফাটিতে উদ্যত হৃদয়টাকে ফাটানর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য, অতি জোরে একটা দীর্ঘ নির্শ্বাস ফেলিল। পরে কুটীরে আসিয়া আহারাদি করিয়া, ছেঁড়া কাপড়, খালি পায়ে, কার্য্যস্থলে জমীদারের বাড়ী চলিয়া গেল।

২।

মানুষের হাত ত নয়! ঈশ্বরের হাত। তিনি যা ভাল দেখেন তাই করেন। মনে খেয়াল উঠিয়াছিল তাই স্বর্গীয় কেশব বাবুকে

বিপুল সম্পত্তি দিয়া কয়েক দিন তাহাকে অপার সুখ ভোগ করাইলেন। তাঁকে আর আটকায় কে? ৭৪ বৎসর বয়সে মা গঙ্গার দ্বারা তিনি তাহাকে গর্ত্তচ্যুত করিলেন। মাতৃহীন পাঁচ বছরের দিব্য একটী মেয়ে আর আঠার বছরের একটী কিশোর তাঁর জন্য কাঁদিল। আর কাঁদিল পাড়া প্রতিবাসী ও ভিক্ষুকের দল। কিশোর বয়সী শৈলেন অনেক চেষ্টা ক'রেও বাপের সম্পত্তি পাইল না। শয়তান নায়েব টাকা খাইয়া কেশব বাবুর দূর সম্পর্কীয় এক ভাইকে সম্পত্তি দিল। বলিল—দান পত্র আছে। ধনীর ছেলে শৈলেন নিজের যা ছিল তার সাহায্যে উক্ত ব্যাপার সরকার বাহাদুরের কর্ণগোচর করিল; ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। বিলাত বলে যে কোথায় একটা দেশ আছে, ব্যাপার সেখানে গেল, দেশ দেখতে নয় সুবিচার হবে, সেই জন্য। শৈলেনর হাতে যা ছিল এতে সব গেল। শৈলেন সে জন্য ভাবিল না। কিন্তু ছোট বোনের কথা মনে হইল। প্রাণটা হেঁচকে উঠল। সবে মাত্র দুটী ছেলে তাতে আবার ছোট। সকলের যে বড় আদরের! শৈলেনের মনে পড়িল, রোগ শয্যায় তার মা সোনাকে (স্বর্ণময়ী) সঁপে দিলে, মায়ের মরণজনিতআশঙ্কার বেদনা বুকে চাপিয়া রাখিয়া সোনার ভাল মন্দের ভার নিয়েছিল। তার জন্য ত শৈলেনের ভাবা চাই! শৈলেন তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া সোনাকে নিয়ে নদী ওপারের জমীদারের জমীদারীতে চলিয়া গেল। শৈলেন এণ্ট্রেন্স পাশ। জমীদারের কাছারীতে দশ টাকা বেতনে একটা কাজ পাইল। শৈলেন প্রায় দেড় মাস অবধি কাজ করিতেছে। সোনাকে খাওয়াইল। পরে পাশের বাড়ীর নূতন পাতান বিন্দি পিসির হাতে দিয়া নিজে দুটী মুখে দিয়া কাছারী গেল।

৩।

"দিদি"

"ই—,খালি বাড়ীটা প্রতিধ্বনি করিল—ই।" কিন্তু এত স্নেহের আবাহণের কোন উত্তর আসিল নাত! শৈলেনের কলিজাটা যেন মুচ্‌রিয়া গেল। প্রাণটা চমকিয়া উঠিল। ঘরে গিয়া দেখে সোনা নাই। প্রতি দিন সোনা ঠিক এমন সময় বাড়ী আসিয়া থাকে; কারণ সে জানে এই সময় তার দাদা আইসে ও তাকে স্নেহপূর্ণ 'দিদি' সম্বোধনে ডাকে। যেই তার দাদা ডাকে অমনি ছুটীয়া গিয়া দাদার গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়ে। কিন্তু আজ আর সে আসিল না। শৈলেন তাড়াতাড়ি বিন্দিপিসির কাছে গেল। কিন্তু সেখানেও সোনা নাই। শৈলেন পাগল হইয়া এ বাড়ী সে বাড়ী এ পাড়া সে পাড়া খুঁজিতে লাগিল কিন্তু কোথাও সোনাকে পাইল না। শৈলেন বাড়ী আসিয়া মাথায় হাত দিয়ে বসিল। শৈলেন খাইল না ঘুমাইল না; রাত্রি কাটিয়া গেল; শৈলেন বাড়ীঘর (কুটীর হ'লেও বাস গৃহ ত।) ভুলিল, কিছুদিন পরে হয়ত আপীলের শেষ মীমাংসা আসিত, শৈলেন তা ভুলিল, শৈলেন সব ভুলিল, ছোট বোন, আদরের ছোট বোনের উদ্দেশ্যে শৈলেন কোথায় চলিয়া গেল।

৪।

শিশির মহাসাগর ভেদ করিয়া, পশ্চিম মুখে আলোর স্রোত ঢালিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব আকাশ সিঁদুররঞ্জিত করিয়া অরুণ দেব তরুণ সাজে সাজিয়া ধীরে ধীরে তুষারধবল পৃথিবীতে দেখা দিলেন। বঙ্গীয় শারদঊষা-সিক্ত-হরিৎ-ধান্য-শীর্ষচুম্বিত, ধীর বাতাস ক্লান্ত পথিককে প্রচুর আরাম আনিয়া দিতেছে। পথিক ময়দানস্থিত বিচালীপূর্ণ তক্তাখানির ভিজা খড়গুলি ফেলিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল,—ঘুমাইল। ক্লান্ত পথিক! ঘুমাও। কারণ এইখান থেকে এই অবসরে, তোমার জীবনের দ্বিতীয় অঙ্ক অভিনীত হইবে।

ধীরে ধীরে অনুমান চৌদ্দ বছরের এক সুন্দরী বালিকা আসিয়া

পথিকের পাশে দাঁড়াইল। যেন স্বয়ং ঊষা দেবী তাঁহার শরৎকালীন প্রভাতে এত অধিক কুয়াসা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া ঘরে শুইয়া থাকিতে না পারিয়া বাহিরে বেড়াতে এসেছেন। বালিকা ধীরে ধীরে পথিকের ললাট স্পর্শ করিল। পথিক তখন সুষুপ্তির কোলে, কাজেই কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরে যখন সোনার কিরণ আসিয়া পথিকের ললাট স্পর্শ করিল পথিক আস্তে আস্তে তখন জাগরিত হইল। উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল থাকায় পড়িবার উপক্রম হইল। অমনি বালিকা ধরিয়া ফেলিল। তারপর হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে বাড়ী গিয়া এক ঘরে প্রবেশ করিল। ঘুমন্ত দাদাকে জাগরিত করিয়া পথিকের শুশ্রূষার ভার তার হাতে দিয়া বালিকা চলিয়া গেল।

স্নেহের আকর্ষণে এক সপ্তাহ থাকিয়া শরীর একটু সবল হইলে পথিক গন্তব্য পথে বাহির হইল। ফটকের কাছে গিয়ে পথিক ফিরিয়া চাহিল দেখিল ছল ছল আঁখি দুটি অপলক দৃষ্টে চাহিয়া অনিচ্ছার সাথে বিদায় দিতেছে। এই এক সপ্তাহে উভয় উভয়কে দিয়াছে নিয়াছে বিনিময় করিয়াছে। তাঁদের বাসনা পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক হে ভগবান।

৫।

নমুনা পৃথিবীর অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত বড় বড় সহর ও তীর্থ স্থানে সোনার খোঁজ করিয়া ও এই গল্পের চতুর্থ পরিচ্ছদের নায়ক হইয়া শৈলেন একদিন নিজের গ্রামে আসিল। একদিন শৈলেন দেখিল যে, তাদের বাড়ীটা খালি পড়িয়া আছে। সে বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কারণ সে জানিত যে, জ্ঞাতীরা দখল করা অবধি ও বাড়ীতে আছে। পরে শুনিল আপীলে সে তার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়াছে। তখন সে আর কি করে, বুকের ব্যথা চাপিয়া ধরিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

শৈলেনের এখন দুই চিন্তা। প্রথম চিন্তার মূলে সোনা, দ্বিতীয় চিন্তার মূলে নীলাম্বরী কিনা—চতুর্থ পরিচ্ছেদের নায়িকা। দুই চিন্তাই প্রবল। কিন্তু যখন তুলনা করিত, শৈলেন দেখিত সোনার ভাবই বেশী। সে তখন সোনার চিন্তায় আপনহারা হইত। কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইত। সে তখন কাঁদিয়া বুক ভাসাইত।

৬।

"ওগো, কে আছ গো, আমায় বাঁচাও, আমায় জোর ক'রে বিয়ে দিচ্ছে।"

পথিক অশ্ব বল্গা টানিয়া ধরিল।—কেবল ছোট বড় পাহাড়ের মাথায় ও বড় গাছের আগায় সিন্দুর মাখা কিরণ ছিল। তখনই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। আর সবে মাত্র সন্ধ্যায় ছাড়িল। বকুল ফুলের মতন এখানে সেখানে অবিরত টুপটাপ করিয়া গাছপালা হইতে যেন মুক্তাফল পড়িতেছে এবং জলে বিলীন হইতেছে। বর্ষাসিক্ত পাখী ঝট্‌পট্ করিয়া পাখা শুকাইতেছে খোলা জায়গা পাইয়া শেয়াল আরামে বসিয়া গা চাটিতেছে এ হেন সময় পথিক বন্ধুর শীকারের নিমন্ত্রণ পালন করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। তাড়াতাড়ি ফিরিবার জন্য পথিক সোজা অথচ জঙ্গলের রাস্তা ধরিয়াছে। নিবিড় বনস্থিত পথের এই ভাগের বাম পাশে প্রায় পথের উপর বহুদিনের পুরাতন ইট ও পাথরের একটা স্তুপ আছে। এই স্তুপের ভিতর দুইটা সেঁতসেঁতে বড় বড় কুঠরী আছে। একটা মাত্র দ্বার। সর্ব্বদা মস্ত একখানা তক্তা দিয়া চিরকাল বন্ধ থাকে। কেহ ফিরিয়াও দেখে না উহাতে কি আছে। আর দেখবেই বা কে? ক্বচিৎ কেহ বড় দরকারে এই রাস্তা দিয়া পথ চলে। পার্ব্বত্য অন্যান্য রাস্তার চেয়ে এটা বড় দুর্গম। পথিক বহুপূর্ব্বে এই পথ দিয়া একবার তার বন্ধুর বাড়ী গিয়াছিল। আজ হঠাৎ এই আর্ত্তনাদ শুনিয়া ঘোড়া থামাইল। আবার কাতর কণ্ঠে শব্দ হইল, "কাকা, জ্ঞাতি হলেও

আমায় বাঁচান।”—যার মুখ দিয়া এতগুলি কথা বাহির হইল, এত গুলি কথা বলিয়া সে যেন ক্লান্ত হইল ও সশব্দে হাঁপাইতে লাগিল।

পথিক স্থির, উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিত।

“কি সোনা কথা শুনবি না? আচ্ছা এবার আমি নীচে যাচ্ছি। দেখি রক্ষা করবার তোর কে আছে আসুক দেখি।”

“আমি আছি. এই যে আমি এসেছি।”—স্তম্ভিত, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, “আমি এই বালিকাকে নিয়ে চল্লুম। তোমাদের যা ইচ্ছে কর।” এই বলিয়া পথিক যেমন বালিকার হাত ধরিয়া বাহির হইতে উদ্যত হইয়াছে অমনি এক বাঙ্গালী আসিয়া (এ স্থানটা বম্বে প্রেসিডেন্সির একটা পাহাড়ে জায়গা। এইজন্য বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী ও মারাঠিকে মারাঠি বলিয়া উল্লেখ করিলাম।) পথ আগুলিয়া ধরিয়া বলিল, “বটে, কিন্তু তুই কেরে কুকুর?”—পথিক হস্তস্থিত বল্লম দ্বারা প্রতিদ্বন্দির পায়ে বিষম আঘাত করিল। এবার আর একটি বাঙ্গালীও দুজন মারাঠি আসিল। পথিক মুহূর্ত্তে পলায়মান বন্দুক লইয়া একজন মারাঠির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, “বাধা দিও না আমায় ভালয় ভালয় যেতে দাও। নৈলে এর কাজ এ করবে।”

পথিক বালিকাকে লইয়া অশ্বারোহণ করিয়া পার্ব্বত্য উচু নীচু পথ দিয়া চলিল। দুপাশে পাহাড় প্রায় বিশ ফিট উচু পথিক সেখানে নামিল। বড় একখণ্ড পাথরে ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিয়া খানিক এক খণ্ড পাথরের উপর বসিল। নিকটেই আর একখানা পাথরে বালিকা বসিল।

সমস্ত উপত্যকাটি যেন সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিমগ্ন। অফুরন্ত শিশির শ্বেত জোছনা সমস্ত উপত্যকাটিকে প্রকৃতির নিঝুম বিবাহবাসরে পরিণত করিয়াছে। অসীম উচ্চে চাঁদ হাসিতেছে, তাহার হাস্যচ্ছটা পরিয়া এই পার্ব্বত্য প্রকৃতিও হাসিতেছে। চাঁদ ভারী দুষ্টু।

সালঙ্কারা প্রকৃতি সুন্দরী হাসিতেছে, আর অমনি সে তাহার সুরসিক দূত মলয় পবনকে পাঠাইয়াছে। সে আসিয়া নানা জাতীয় পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের সুবাস বহিয়া লইয়া যাইয়া চাঁদকে ও জগতবাসী-দিগকে প্রকৃতি সুন্দরীর গন্ধস্মৃতি-রেণু দিতেছে! মলয় বাতাস এমন নাছোববান্ধা সে বালিকারও সহিত খেলা করিতে ছাড়িতেছে না। এই কার্পাস সূত্র জোছনায়, তাহার নিবিড় কৃষ্ণ চাকচিক্যময়ী চুল গুলি লইয়া তাহার আনাড়ি হাত দিয়া, যেখানে সেখানে রাখিতেছে। অপচ্ছন্দ হইলে আবার সেখান হইতে লইয়া আর এক জায়গায় বসিতেছে। পরে একটু স্থগিত রাখিয়া দূরে গিয়া দেখে কেমন হইল।

"তুমি এখন কোথায় যাবে?—তোমার বাসা এখানে কোথায়?" অতি কোমল ও স্নেহপূর্ণস্বরে পথিক জিজ্ঞাসা করিল। "আমি কোথায় যাব? আমার এখানে কোথাও বাসা নাই। আমার বাড়ী বাঙ্গালা দেশে। এই দুষ্টু লোকগুলো বদ উদ্দেশ্যে আমায় এখানে নিয়ে এসেছে।"—ভীত ও ক্রন্দন ব্যঞ্জক স্বরে বালিকা বলিল।

"তবে চল এখন আমাদের বাসায় যাই। আমার বাড়ী মুর্শিদাবাদে।"

৭।

এই মুর্শিদাবাদের জমিদার প্রতাপ চাঁদ মজুমদারের বাড়ীতে আজ বড় বেশী গোলমাল শোনা যাইতেছে। কেনই বা তা হবেনা। তাঁর একমাত্র মেয়ে শ্রীমতি নীলাম্বরীর (এটা তার কুষ্টির নাম নহে) কুষ্টির নাম বিরজা। কিন্তু ঠাকুরদাদা নীলবর্ণ সাড়ী পরিতে নাতিনীর আগ্রহাধিক্য ও প্রিয়তা দেখিয়া, তাহাকে নীলবর্ণ শাড়ী পরিতে দিতেন ও নীলাম্বরী নাম করণ করেন।) ও সপ্তাহে বিবাহ। বর আমাদের শৈলেন। অভিভাবকহীন শৈলেনকে নিজেই বিবাহ করিতে আগেই আসিতে হইয়াছে।

মজুমদার মশায়রা শাক্ত। মেয়ের বিয়ে। কাজেই শক্তিপূজার জন্য ছাগ হংসাদি ও অন্যান্য দ্রব্য তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন।

শৈলেনরা বৈষ্ণব। তাহার পিতা প্রাণীবধের বড় বিরোধী ছিলেন। শুভ ব্যাপার ত দূরের কথা, তাঁহারা বিশেষ কোন কারণে ও প্রাণীহত্যা কর্ত্তেন না। শৈলেনের বাপের নিষেধ ছিল, সে যেন তার বিয়েতে আমোদ বৃদ্ধির জন্য জীবহত্যা না করে। ছোট বেলায় শৈলেন খাবার জন্য চুপি চুপি হাঁস, কবুতর মারিত। টের পাইয়া তার বাবা তাকে প্রাণীহত্যা না করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন।

এখন বিয়েতে শক্তি পূজার আড়ম্বর দেখিয়া শৈলেন তার বাল্য বন্ধু বীরেশ্বরের দ্বারা মজুমদার মশায়কে তার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। কিন্তু তিনি শক্তিপূজা বন্ধ করিতে স্বীকার করিলেন না। শৈলেনের অনুরোধে বীরেশ্বর আরো দুইবার মজুমদার মশায়কে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তৃতীয়বারে মজুমদার মশায় উত্তর করেছেন, "কি এ সব চাষার মত ব্যবহার কচ্ছ বীরু আমার সাথে। আমি যা ইচ্ছে করেছি তা ক'রব।"

বীরেশ্বরের অবস্থা ভাল। সে ভদ্রলোকের ছেলে, নিজেও শিক্ষিত ও ভদ্রলোক অমন একটা কথা বীরুকে মুখের উপর কেউ বলে নাই। আজ মজুমদার মশায়ের কথায় তার মনে একটু আঘাত লাগিল। কিন্তু বন্ধুর কথা মনে করিয়া তাহা সহ্য করিল। কিন্তু মনে একটু খটকা লেগে রৈল।

আর বিয়ের মোটে চার দিন আছে। না বলিলেও নয়। শৈলেন আর একবার বীরুকে বলিল, কিন্তু বীরু তাকে নিজে বলিতে বলিল। কাজেই শৈলেন কর্ত্রীঠাকুরাণীকে গিয়া সব কথা খুলিয়া বলিল। কিন্তু কর্ত্রীঠাকুরাণী বলিলেন, "তা কি করে হয় বাছা। কর্ত্তা যেমন লোক উনি কি আর সম্মত হবেন।" "কথাটা কি?" এই বলিয়া এমন

সময় মজুমদার মশায় আসিলেন। 'না এমন কিছু নয়, তবে ওরা বলছে, শুভ ব্যাপারে জীব ?——,,——অমনি আটকে গেল। বাকী টুকু কথা মজুমদার মশায় আর বলতেই দিলেন না! কর্ত্তৃঠাকুরাণীর মুখের কথা মুখেই রইল, কেবল হাঁ করে তাকাতে লাগিলেন।

মজুমদার মশা'র স্বভাব তিনি এক কথার বারবার উল্লেখ দেখলে চটিয়া লাল হন। তিনি বীরেশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা ত ভারী চাষা বীরু! এককথা বারবার ফ্যাচ ফ্যাচ।

বীরেশ্বর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত,—নব্য ধরণের লোক। সে ও সব সহ্য করিবে কেন। তার পিত্ত রাগে জ্বলিয়া গেল। সে বলিল, "আপনি মুখ সাম্‌লে কথা বলবেন মজুমদার মশায়। বারবার চাষা বলা ভাল নয়। আমার বোধ হয় চাষা ব্যতীত অন্যে এরূপ কথা অন্য এক ভদ্রলোকের ছেলেকে বলতে পারে না। আশ্চর্য্য! আজ বন্ধুর বিয়েতে এসেছি বলে, আমি আমার মান সম্ভ্রম ধুইয়ে আসিনি।"

'বটে, বড় ভদ্রলোকের পো এসেছে। ছোট লোক, হাড়হাবাতের ছেলেকে মেয়ে দিচ্ছি,—আর উনি বন্ধুর উছি হয়ে বড়লোকের ছেলে হয়ে এসেছেন। বেরো বাড়ী থেকে। কোন হারামজাদার ছেলেকে মেয়ে দিচ্ছি না।"—দম বন্ধ হইল, কাজেই মজুমদার মশায় থামলেন।

"চুপ কর বীরু"—এর উত্তরে বীরু কি বলিতেছিল, এমন সময় শৈলেন আসিয়া তার হাত ধরিয়া বলিল, "চুপ কর বীরু। আমার যা কিছু আছে ঠিক করে নিয়ে তুমি এখনি রওনা দাও। জিনিষগুলা আমার বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিও। খুড়োঠাকুরকেও নিয়ে যাও।"

জনৈক ঝি বলিল, "সে কি। তোমার পুরুতঠাকুর গেলে যে শেষে আমাদের পুরুত দিয়া বিয়ে দিতে হবে। উনি থাকুন্ না।"

রক্ত জবা চোখ দিয়ে ক্রোধাগ্নি উদ্গীরণ করিয়া শৈলেন বলিল, 'চুপ কর্ মোক্ষদা।'

'ছি বাবা রাগের মাথায় কি কোন কাজ করতে আছে। সকলেই রাগলে, তুমি না হয় একটু থাম।'

সমস্ত বাড়ীখানি শুদ্ধ সকলের হৃদয় এককালে কম্পিত করিয়া দম্ভভরে বজ্রনাদে শৈলেন বলিল, 'চাই না মা।' সমস্ত বাড়ীখানিতে তার বজ্রনাদের প্রতিধ্বনি গুমরিয়া গুমরিয়া বেড়াইতে লাগিল।—'চাই না মা।' আমি এ বিয়ের মাথায় ঘৃণার সহিত পদাঘাত করি। আমি আর আপনার মেয়ের জন্য লালায়িত নই। যারা ধনমদে মত্ত হয়ে নিরীহ মানবকে হেয় মনে করে, তারা আমার কুটুম্বের যোগ্য-পাত্র নয়। জানি আমি মা,—কিছুই আমার বাঞ্ছিত নয় নীলাম্বরী ছাড়া—কেহই আমায় শান্তি দিবে না নীলাম্বরী ছাড়া,—জীবনে আমি কেউকে ভাল বাসিনি,—অবসর পাই নি, জানি আমি তার অভাবে আমার জীবন অসার মরুভূমিতে পরিণত হইবে জনম বৃথায় যাইবে—জানি আমি সমস্ত জগত একদিকে, সে আমার অন্যদিকে তবু যার ভার বেশী বোধ হয় তাকে আর আমি চাই না। তাকে আমি পায়ে ঠেলে দুরে নিক্ষেপ করি। যাকে লাভ করতে গিয়ে আজ আমার স্বকর্ণে পিতৃনিন্দা শুন্‌তে হল, সে মায়াবিনী, রাক্ষসী, তাকে আমি চাই না। যে পিতা আমার, হায়, কি করে বলব! যে পিতা আমার কত উচ্চ কত মহান কত পবিত্র! যার চেয়ে আমার শ্রেষ্ঠ পুজ্য আরাধ্য নাই, সেই পিতার অপমান! যার অঙ্গুলীমাত্র সঙ্কেতে অমন সহস্র নীলাম্বরীকে রসাতলে দিতে পারি, সেই পিতা। আমি জানি না, কেউ দেখে নাই ঈশ্বর আছেন কিনা, কিন্তু তিনিই যে আমার ইহকালের প্রত্যক্ষ দেবতা, ঈশ্বর। সেই পিতা যে,

'পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।'

৮।

উক্ত ঘটনার পর একবছর চলিয়া গিয়াছে। আর সে উগ্র প্রকৃতি মজুমদার মশায় বা তাঁহার স্ত্রী নাই। শৈলেনও আর এখন দরিদ্র নহে। আপীলে শৈলেন দশ আনা সম্পত্তি পাইয়াছে।

সম্পত্তি পাইয়া শৈলেনের পুরোন শোক আরও দ্বিগুণ হইয়াছে। আরো সে এক বছর সোনার খোঁজ করিয়াছে; কিন্তু কোথাও সোনাকে পায় নাই।

এক দিন কি এক কার্য্য উপলক্ষে শৈলেন মুর্শিদাবাদে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে একদিন নীলাম্বরীর দাদা মানিকচাঁদ নাগাল পাইয়া অনেক জেদে শৈলেনকে তাদের বাড়ী নিয়ে যায়। পূর্ব্ব হইতে সকলেই ইচ্ছুক ছিলেন বলিয়া, শৈলেনকে অনেক বুঝাইয়া, বিয়ার সম্বন্ধ স্থির করিল। অবশ্য নীলাম্বরীর সাথে। ইহাতে সকলেই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু এ সময় নীলাম্বরী বাড়ীতে ছিলনা। সে তার বৌ'দির সাথে এক আত্মীয়ের বাড়ী গিয়াছিল।

৯

শৈলেনের বাড়ীখানি আজ উৎসব কোলাহল মুখরিত। আত্মীয় কুটুম্ব দাস দাসী সকলেই এক একটা কার্য্য উপলক্ষে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে। কাল শৈলেনের বিবাহ, আজ মুর্শিদাবাদে রওনা দিতে হইবে। কিন্তু এ আনন্দ এ উৎসবের মুলীভূত কারণ যে সেই শৈলেন নির্জ্জন একটী ঘরে বসিয়া কেবলই কাঁদিতেছে। দুই দিন যাবত কিছুই খায় নাই। বাঘার (কুকুর) দ্বারা চুপি চুপি সমস্ত খাবার খাওয়াইয়াছে। সে অনবরত সোনার কথাই ভাবিতেছে। "হায়, আজ যদি সোনা থাকিত! আজ যদি বাবা মা থাকিতেন! এত বড় বংশের কেহই নাই। কেবল আমি এই পোড়া কপাল নিয়া একলাই রইলাম।" বাল্যকালের সমস্ত কথাই একে একে তার মনে আসিতে লাগিল। তারপর কিছুদিন পরে সোনার জন্ম তার

মনে পড়িল স্কুলথেকে এসে বই রেখেই আগে সোনাকে কোলে নিত। কত আদর কত সোহাগ করিত, কত চুমো খাইত। এইরূপে ছোট বোনটিকে আদর করিয়া তার পর সে তার খাবার খাইত। তার পর মনে পড়িল কিছুদিন পরে শৈলেনের মায়ের মৃত্যুশয্যা। অশ্রুপূর্ণ নয়নে শৈলেনের হাতে সোনার ভার অর্পণ। সে সময় তার হৃদয় ভগ্নীস্নেহে পূর্ণ হইয়াছিল। সোনার রক্ষণাবেক্ষন, তার ভাল মন্দের জন্য তার মাতা সে সময় তাকে এক রকম প্রতিজ্ঞা করিয়া নিয়াছিলেন। শৈলেনের শপথ সময় বহুদিন গত, কিন্তু এখন যেন মনে হয় এখনকার শৈলেনের সেই স্নেহ আদরের ভরা গাঙ্গের মত উদ্বেলিত, আবেগ কম্পিত, তাহা যেন সেই প্রতিজ্ঞার উচু গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। সজাগ ভগ্নীশোক প্রবল হইয়া তার চক্ষু নিঙ্গরাইয়া জল ফেলিতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল যেন তার মা স্বর্গ হইতে, ভগিনীর ও তার অন্বেষণে শৈলেনের অবহেলা দেখিয়া তাকে শত সহস্র অভিসম্পাত দিতেছেন।

নিকটবর্ত্তী একটা বাড়ী ভাড়া লইয়াছে। শৈলেন সবান্ধব আসিয়া এখানে আছে। একটু পরে পাত্রীবাড়ী যাইতে হইবে। বড়ই ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

ধনী শৈলেন মহা সমারোহে পাত্রী বাড়ীতে আসিল। বর আসিল বলিয়া পাত্রী বাড়ীতে মহা ধুম পড়িয়া গেল। সকলেই মহাব্যস্ত ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে। পাত্রকে নানা প্রকার চিত্র শোভিত একখানা কাষ্ঠাসনে দাঁড় করান হইল। এখন বাকী কেবল বাড়ীর গৃহলক্ষ্মী আসিয়া পাত্রকে বরণ করিবেন। তাহা হইলে আপাততঃ জামাই বাবু একটু অবকাশ পান। বিবাহ পরে আস্তে আস্তে হইবে।

এমন সময় এক কি বলিব ? এক সুন্দরী—, হ্যাঁ সুন্দরী যে যে উপাদানে গঠিত হইলে তাকে দেবী আখ্যা দিয়া সুন্দরী বলা

যাইতে পারে, সেইরূপ এক সুন্দরী কিশোরী সুনীল সূক্ষ্ম রেশমী চেলি দিয়া আপাদ মস্তক দেহ চাপিয়া বর বরণ করিতে আসিল। কিন্তু একি! বর বরণ করিতে আসিয়া যেই চারি চক্ষু একত্র হইল, পরস্পর পরস্পরের দিকে ছুটিল, পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরিল, তারপর দুটী দেহ একটী হইয়া এককালে মাটিতে পড়িয়া গেল। কোন কথা হয় নাই। " এযে আমার সেই হারানো" বরের মুখ হইতে কেবল এই কথা গুলি শুনা গিয়াছিল।

শ্রীক্ষীরোদকান্ত দাস।

---

(১) নিরাশায়।

শান্তি, সে যে ভুলে গেছে বহুদিন;
আশা, সে যে নিরাশ আঁধারে লীন;
সুখ, সে যে স্বপনের খেলা সম;
দুঃখ, সে যে ঘেরিয়াছে বিশ্ব মম।
শান্তি, আসিবেকি পুনরায়?
আশা, জুড়াবে কি হৃদি হায়।
সুখ, নাহি ক্ষতি থাক দূরে,
দুঃখ, থাক তুমি প্রাণজুড়ে।
শান্তি, রহিবে কি প্রাণে মোর?
আশা, তুমি যে কুহকী ঘোর
সুখ, তোমারে চাহিনা আর
দুঃখ তুমি সাথী সবাকার।

শ্রীঅনাদিকান্ত দত্ত।

---

(২) জাননা।

জাননা তোমার তরে
ঝরে দুটী আঁখিতারা
শতত আপনা ভুলে তোমাতে হতেছি হারা
মুগ্ধ হৃদয়ের মোর উচ্ছলিত প্রেমনদী
ছুটিছে তোমার পানে দিবানিশি নিরবধি
উদাস নয়ন দুটী আকুল উৎকণ্ঠা লয়ে
তোমারি দরশ আশে থাকে তব পথ চেয়ে।

শ্রীঅনাদিকান্ত দত্ত।

শরতের পল্লী।

বঙ্গের পল্লীসমূহে শরদাগত। বর্ষায় পল্লীসমূহ দ্বীপসদৃশ প্রতীয়মান, নিরন্তর বারিধারায় ক্ষত বিক্ষত এবং নিরানন্দময় ছিল, শরদাগমনে তাহা হর্ষোৎফুল্ল এবং আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত। বর্ষাতে গগন নিবিড় নীলিমাময় মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, শরতের মৃদু পাদবিক্ষেপে তাহা পূর্ণেন্দুর রজত শুভ্রোজ্জ্বল কিরণমালায় উদ্ভাসিত। যখন প্রভাতে অরুণ নবরাগে গগনপ্রান্তে উদিত হইয়া শিশিরশিক্ত তৃণ-ভূমির উপর আপন স্নিগ্ধ কিরণ বিস্তার করে তখন মনে হয় যেন শত শত হীরকখণ্ড ভূমির উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। যখন নাতি-শীতোষ্ণ সমীরণ সংস্পর্শে শাখা কম্পিতকলেবরা হইয়া আপন অঙ্গা-ভরণ পত্রিকাকে বৃন্তচ্যুত করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করে তখন মনে হয় যেন সে বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইয়াছে অথবা স্বামীবিয়োগে বিধবা সাজে সজ্জিত হইতেছে।

ঐ যে অদূরে ক্ষীণা লতাটি আপন স্বামী বৃক্ষের বক্ষ জড়াইয়া

ধরিয়া হৃদয়ের দুঃখব্যথা জ্ঞাপন করিতেছে, নির্দ্দয়া স্রোত তাহাকে স্বামীর অঙ্গচ্যুত করিবার জন্য সজোরে আকর্ষণ করিতেছে। যখন মধ্যাহ্নে সূর্য্যতাপে প্রকৃতি নিরানন্দে নির্জীব থাকে, তখন বৃক্ষশাখায় বসিয়া কে প্রকৃতিকে জীবন দান করে? কাহার সুমধুর স্বরতরঙ্গ-লহরী অর্দ্ধনিমীলিতা প্রকৃতিকে জাগাইয়া তোলে?

সন্ধ্যায় যখন নৌকারোহণে ভ্রমণে বহির্গত হই এবং যখন নির্ম্মল জলতরঙ্গ তরণীর তলদেশে তর্‌তর শব্দে আঘাত করে তখন মনে হয় ইহারা নীরব ভাষায় কত মনোব্যথা জানায়। সন্ধ্যানীরে কত নৌকা পালভরে গা ভাসাইয়া দিয়া চলিয়াছে। কৃষকগণ নিজ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে। তাহাদের কণ্ঠনিসৃত করুণসঙ্গীত হৃদয়তন্ত্রী ভেদ করিয়া সমীরণ সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল। বাসন্তীর বনে পথশ্রান্ত পথিকের শান্তি উৎপাদনের নিমিত্ত কোকিলও এমন করুণসঙ্গীত করে নাই। তাহাদের সঙ্গীত-ধ্বনি সমীরণস্তর ভেদ করিয়া শরতের নির্ম্মল পল্লী সমূহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। তাহাদের সঙ্গীতে কত মাধুর্য্য কত সরলতা কত বিষাদের চিহ্ন লুক্কায়িত ছিল। তাহাদের সঙ্গীত যেন চরণতলে উৎসারিত হইতেছিল।

সারস পক্ষীর দল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সমতালে পক্ষনিক্ষেপ করিতে করিতে যাইতেছিল। তাহাদের শ্রেণী সরল নহে, চক্রাকার ও ঘুর্ণায়মান যেন গগনের গায়ে ইহা মালাকারে সংলগ্ন ছিল। ইহাদের এইরূপ গতি বড়ই সুন্দর। ইহারা মধুর রব করিতে করিতে যাইতেছিল। আমি আকাশ পানে অতৃপ্তনয়নে চাহিয়া রহিলাম; যতক্ষণ পারিলাম ততক্ষণ এই শোভা দেখিতে লাগিলাম।

অদূরে রাজহংস রাজহংসীর কণ্ঠনিসৃত কোমল কলধ্বনি শ্রুত হইল। সায়াহ্ন গগনে প্রতিধ্বনিত হইল। সেইরবে চঞ্চল তরঙ্গ-বালা নীরব হইল। মুহূর্ত্তের জন্য সমীরণও নীরব হইল। মনে হইল

যেন সে সেই স্বর অনুসরণ করিয়া গগনের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য নৌকার পাল পড়িয়া গেল। নৌকা থামিল। সে রবে প্রকৃতি থামিল। ক্ষণপরে আবার বাতাঘাতে তরঙ্গ উঠিল ; নৌকাও মন্দ মধুর গমনে চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যায় সুধাকর তরঙ্গায়িত সলিলোপরি রজতধারা বর্ষণ করিতেছিল। তরঙ্গ অস্থির হইল ; সুধাকরের সুধা পান করিবার জন্য প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। নিষ্ঠুর সুধাংশু মেঘের আড়ালে গিয়া লুকাইল। আর তরঙ্গ ? সে আরও অস্থির হইল।

নিষ্ঠুর এইরূপে নক্ষত্রবালাদিগকেও কত কাঁদায়। মেষচর্ম্মবৎ মেঘের নীচে লুকাইয়া থাকে, নক্ষত্রবালাগণ তাহার প্রতীক্ষায় বিরলে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করে, নিষ্ঠুর হাসে। ক্ষণেকের দেখা দিয়া আবার লুকায়। অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে তাহাদের সমস্ত শর্ব্বরী শেষ হইয়া যায়। তাহাদের অশ্রুতে পৃথিবী সিক্ত হয়—তবুও পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হয় না।

শরতের সজল-জলদ-জালাবৃত-গগনের তলে সরোবরে বিকসিত পদ্মিনী ইন্দুর সহিত হাসিতেছে। কিন্তু সপত্নী বিদ্বেষিনী তরঙ্গবালার চক্ষে তাহা সহ্য হইল না। সে আপন তরঙ্গ বিস্তার করিল। পদ্মিনী উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল ! ভ্রমর—আসিল, মনে হইল যেন সে পদ্মিনীকে উদ্ধার করিতেই আসিল। কিন্তু সে কম্পিতা নলিনীর উপর বসিতেও পারিল না। অবশেষে বিফলমনোরথ হইয়া সে কুমুদিনীর নিকটে গেল ; কুমুদিনী নিমীলিতা হইল মনে হইল যেন ভ্রমর পদ্মিনীর নিকট ছিল বলিয়া কুমুদিনী তাহাকে স্থান দিল না। অবশেষে ভ্রমর গুন্ গুন্ করিতে করিতে আপন মনে কোথায় চলিয়া গেল।

ইন্দুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণমালায় শরৎ বিকসিত এবং শিশিরসিক্ত প্রকৃতি হাসিয়া উঠিল। গুচ্ছ গুচ্ছ শেফালি কুসুম ক্ষীণ বৃন্তে

ভর দিয়া উৰ্দ্ধমুখে সুমিষ্ট গন্ধ বিকীরণ পূর্ব্বক জ্যোৎস্নাপ্লুত ধরণী ও বায়ুস্তর সুরভিত করিতেছিল। নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সকলেই আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত ও মাতোয়ারা। সকলের হৃদয়েই শান্তি বিরাজমানা। কেবল শান্তি নাই একজনের হৃদয়ে। তাহার কাতর হৃদয়ের যে নীরব বেদনা উচ্ছ্বাস বিধাতার উদ্দেশ্যে উৎসারিত হইতে লাগিল, তাহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, জাগ্রত, অনাদি, অনন্ত, দেবতা ভিন্ন অন্য কাহারো মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল না।

আমার ধাঁধাঁ।

আমার ধাঁধাঁর নাহি অবসান
দিন দিন শুধু বাড়িয়া যায়।
আছে কি জগতে হেন মহাজন,
এ গূঢ় সমস্যা বলেন আমায় ?
কোথা হ'তে নর আসে পৃথিবীতে ?
কোথায় সে দেশ কেমন তর ?
জনমে কি হেতু এই পৃথিবীতে,
এক নর হতে অপর নর ?
কি হেতু জগতে জনম লভিয়া
তখনই আবার চলিয়া যায়।
যাইতে যাইতে ফিরিয়া ফিরিয়া
পৃথিবী পানে কি কভু তাকায় ?
মরণের পর আবার তাহারা
কিরূপ প্রদেশে চলিয়া যায়,

আছে কি সে দেশে এইরূপ ধারা
সরসী বিহগ, পাদপ চয়…?
যতই বুঝিতে করিছি যতন
ততই ধাঁধাঁ যে বাড়িয়া যায়।
কে আছে জগতে হেন মহাজন
এ গূঢ় সমস্যা বলেন আমায়।

শ্রীতারাপদ রায়।

মলিনা।

১

শীতকাল। নদীর জল কমিয়া আসিয়াছে। জল একটু ঘোলা হইয়াছে। পানের অযোগ্য। বর্ষাকালে জলের স্রোত কত লোককে যে স্বীয় বিপুল গহ্বরে স্থান দিয়াছিল তাহার অন্ত নাই। কিন্তু এখন সেই উগ্রমূর্ত্তিবিশিষ্টা তটিনী শান্তময়ী। আজকাল আর সেইরূপ রাতদিন বৃষ্টি হয় না, তাহার পরিবর্ত্তে দিবাভাগে সূর্য্যালোক ও রাত্রে চন্দ্রদেবীর সুস্নিগ্ধ কিরণ সমস্ত জগতে অবস্থান করে।

আজ চন্দ্রের কিরণ একটু বেশী উজ্জ্বল। যদি কুয়াসা না পড়িত তাহা হইলে বোধ হয় আরও উজ্জ্বল হইত। সেই গগন উপরি হইতে চন্দ্রের কিরণ ঘন-সন্নিবিষ্ট-তরুরাজির মধ্য দিয়া স্থানে স্থানে স্বীয় উজ্জ্বলতার আভাস দান করিতেছে। নদীপার্শ্বস্থিত অপ্রশস্ত পথে মলিনা ফুলের সাজি লইয়া যাইতেছিল। অদূরস্থিত বাঁধা ঘাটে বিজয় বসিয়া আনন্দে গান গাহিতেছিল আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে বংশীর সুমিষ্ট স্বরও শুনা যাইতেছিল।

পথের একপার্শ্বে রায়বাটীর উদ্যান আর অপর পার্শ্বে সেই শান্তি-ময়ী নয়নরঞ্জনকারিণী জাহ্নবী। মলিনা ফুলের সাজী পূর্ণ করিয়াছিল

কিন্তু তখনও সেই উদ্যানস্থিত বৃক্ষের মধ্যে বহু পুষ্পরাশি শোভা পাইতেছিল। মলিনা প্রথমে আসিয়া ফুলগুলিতে নির্ম্মল জল ছিটাইয়া দিল তাহার পর সেই ফুলের সাজি হস্তে করিয়া দেবমন্দিরমুখে গেল। তখন তাহার মাতা জাহ্নবী পূজায় বসিয়াছিলেন। মলিনা ফুলগুলি তাঁহার পার্শ্বে রাখিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে নতজানু হইয়া প্রণাম করিল।

আজ তাহার ফুল আনিতে দেরী হইয়াছিল। মাতা ফুলগুলি লইয়া ঠাকুরের মাথায় নিক্ষেপ করিলেন তাহার পর তিনি নিজেও মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিলেন। মলিনা কিন্তু তখনও তাঁহার পার্শ্বে করপুট হইয়া বসিয়াছিল। মাতাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া বালিকাও প্রণাম করিল। তাহার পর মাতা ধীরে ধীরে পূজার আসন পরিত্যাগ করিয়া উল্টাইয়া রাখিলেন। পূজা শেষ হইয়াছে দেখিয়া বালিকাও ধীরে ধীরে মন্দির হইতে বহির্গতা হইল। যখন জাহ্নবী উঠিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "আমার মলিনার যেন বিজয়ের সহিত বিবাহ হয়।" এই বলিয়া তিনিওসেইস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

কয়েক দিবস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিজয়কে কেহ খুঁজিয়া পাইতেছেনা। অনেকে মনে করিল বোধ হয় কোনও আত্মীয় কুটুম্বের বাঁড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে কেহ কেহ মনে করিতেছিল বোধ হয় বিজয় কোনও নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আনন্দে গান গাহিতেছে; কেননা গাওয়াটা তাহার স্বভাব কিন্তু সে ওরূপ কোনও স্থানে নাই। সে আছে যে স্থানে ব্যাঘ্র সিংহ প্রভৃতি ভয়াল জন্তু বাস করে, সেই স্থানে। সারাদিবস ঘুরিয়া ফিরিয়া সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল আর আশ্রয়ের স্থান অনুসন্ধানে হতাশ হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। পক্ষিগণ আর রব করিতেছেনা।

রাখাল গোপাল লইয়া অনেকক্ষণ হইল বাড়ী ফিরিয়াছে। নিশাচরগণ আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ আকাশে চন্দ্র নাই। সমস্ত গগন তারকা শ্রেণীতে আবৃত। সে তারকা মণ্ডলীর আলোক আর কত দূর যাইবে। তাই পৃথিবীতে কেবল একটু উজ্জ্বলতার আভাস দান করিয়াছে। তাহাতে কেবল পথ মাত্র লক্ষিত হয়। সেই বিজন বৃক্ষাচ্ছাদিত বনের মধ্যে বিজয়।

২।

মলিনা পূর্ব্বে যেরূপ আনন্দের সহিত ফুল তুলিতে যাইত আজ আর সে সেরূপ হাসিমুখে যাইতেছে না। প্রথমবার ফুল তুলিতে বলাতে মলিনা মুখ ভার করিয়াছিল। তাহার পর আর পা সরেনা। হৃদয় উচ্ছ্বাস সামলাইতে না পারিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু মুখে কথা সরে না। কাঁদিতে যায় কাঁদিতে পারেনা; মরিতে যায় মরণ আসে কই? যাহা হউক কোনও রূপে উদ্যানে আসিয়া পড়িল। ফুল তুলিতে যায় হাত উঠে না। বালিকা তখন কাঁদিল। কান্নার রোল অতি সকরুণ ও কাতরতাব্যঞ্জক। নেত্রবারি বর্ষার জল। ঝড় উঠিলে, শিলাবৃষ্টি হইলে, বজ্র পড়িলে সহ্য করা যায়, কিন্তু কান্না পাইলে সহ্য হয় না।

তখন আর উদ্যানে কেহ নাই। কেবল মলিনা ও এক জটাধারী সন্ন্যাসিনী। যখন বালিকা ফুল তুলিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, তখন সন্ন্যাসিনী বালিকার পশ্চাতে বসিয়া তার ভাব ভঙ্গিমা লক্ষ্য করিতেছিল, এক্ষণে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া পড়িল।

মলিনাও তাহাই চাহিতেছিল। কতক্ষণ পরিশ্রমে কাতর হইয়াছিল। যখন মলিনা সন্ন্যাসিনীর ক্রোড়ে শুইল তখন যেন কোন দেবতার স্পর্শে তাহার অঙ্গ শীতল হইল। সন্ন্যাসিনী বালিকাকে

বলিলেন "হাঁ মা তোর কি মা বাপ নাই। তুই রোজ একলা ফুল তুলিতে আসিস্ কেন? আচ্ছা আর তোকে ফুল তুলিতে হবে না। আয়, আমার সঙ্গে আয়; আমি তোকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। সেখানে দুঃখ নাই, শোক নাই, বিচ্ছেদ নাই। সেখানে কেবল সেই পরমেশ্বরের পদসেবা।"

মলিনা ইতস্তত না করিয়া বলিয়া উঠিল "যাব"। সন্ন্যাসিনীর মন পলকে আবেশে নৃত্য করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসিনী বলিলেন "তবে আয়"।

আগে সন্ন্যাসিনী পশ্চাতে মলিনা। কত বন, কত মাঠ, কত পথ অতিক্রম করিল। তাহার পর নদী। মলিনা আর চলিতে পারিতেছে না। দু'একবার আছাড় খাইতেছে আবার উঠিয়া সন্ন্যাসিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে—যদি তাহার পতন তিনি দেখিয়া থাকেন। সম্মুখে নদী তাহার উভয় পার্শ্বে সমানভাবে দণ্ডায়মান ও পত্রে পত্রে সংলগ্ন বলিয়া গভীর অন্ধকার। সন্ন্যাসিনী তখন এক বৃক্ষতলে গিয়া বসিলেন। মলিনা ও তাহার অনুকরণ করিল! তখন সন্ন্যাসিনী বলিলেন "মা তোর বড় ক্ষুধা পেয়েছে একটু অপেক্ষা কর, আমি নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে ফলমূল লইয়া আসিতেছি। এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেলেন ও বনবৃক্ষ হইতে কয়েকটি ফল ছিঁড়িয়া আনিলেন। বালিকা সে গুলি প্রায় নিঃশেষ করিল তাহার পর বলিল "জল"।

অদূরে শান্তময়ী জাহ্নবী পক্ষ বিস্তার করিয়া আছেন। সন্ন্যাসিনী তখন জল আনিতে গেলেন।

৩

কিন্তু জল আনিবার পাত্র নাই। এবং সেই জাহ্নবী তট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বন্য জন্তুদিগের কলরব। সন্ন্যাসিনী তখন হতশ্বাস হইয়া পড়িলেন। একদিকে বালিকা জল না পাইলে বাঁচিবে না আর

অপর দিকে সন্ন্যাসিনীর মৃত্যু নিশ্চয়। কিন্তু উপায় কি? পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ যেন কি তাহার পায়ে ঠেকিল আবার সঙ্গে সঙ্গে একটু মড় মড় শব্দ হইল। সন্ন্যাসিনী তখন অন্ধকারে হস্ত প্রসারিত করিয়া দেখিলেন যেন একটি পাত্রের মত কি পড়িয়া আছে। তিনি উহা উঠাইয়া লইলেন ও নদীর দিকে গমন করিলেন। যে স্থানে সেই বন্য জন্তুগুলি ক্রীড়ায় মগ্ন ছিল, সন্ন্যাসিনী যখন সেই স্থান দিয়া যান তখন হিংস্র জন্তুগুলি তাঁহার পথ ছাড়িয়া দিল।

সন্ন্যাসিনী অন্ধকারে হস্তস্থিত দ্রব্যটি যে কি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। যখন তিনি উহা জলে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন সেই সময়ে নিকট হইতে কে যেন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "সন্ন্যাসীর প্রাণ জলে বিসর্জ্জন দিওনা। আর সন্ন্যাসী বাঁচিবেনা। মলিনাও বাঁচিবেনা। উহাই সন্ন্যাসীর প্রাণ, উহাতে সন্ন্যাসীর জীবন।"

মত্ত মাতঙ্গ যেমন মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে, সন্ন্যাসিনীও সেইরূপ ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই মুহূর্ত্তে তিনি পাত্রটি জাহ্নবীর পবিত্র জলরাশিতে নিক্ষেপ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বালিকা যেখানে বসিয়াছিল সেই স্থানে আসিলেন।

৪

বালিকার চেতনা ছিলনা। যখন সন্ন্যাসিনী সেই পাত্রটি জলমধ্যে নিমজ্জিত করেন সেই মুহূর্ত্তে বালিকা ভূপতিতা হইয়াছিল। তাহার উন্মুক্ত কেশদাম ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুকোমল শরীর ধুলায় মলিন হইয়াছিল।

সন্ন্যাসিনী বালিকার মস্তকে হস্তস্পর্শ করাতে মলিনা চক্ষু মেলিল। তারপর ওষ্ঠ দুইটি ঈষৎ নাড়াইয়া বলিল "মা জল।"

সন্ন্যাসিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন। হায়! বালিকার জন্য জল লইয়াও আনিলেন না।

অদূরে এক স্থানে একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছিল। সন্ন্যাসিনী তাহার প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন যে সমস্ত বন আলোকময় হইয়াছিল। বালিকা কিছু চৈতনপ্রাপ্ত হইলে সন্ন্যাসিনী বলিলেন ' আয় মা আমার সঙ্গে আয়। এই নিকটেই জল আছে।" মলিনার তখনও একটু শক্তি ছিল, একেবারে শক্তিহীন জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে নাই। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে সন্ন্যাসিনীর অনুসরণ করিল।

যে স্থানে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছিল তাহার পার্শ্বে কাহার যেন মৃত দেহ পড়িয়াছিল। সন্ন্যাসিনী মলিনাকে বলিলেন "তুমি উহার পার্শ্বে বসিয়া থাক। আমি কিছুক্ষণ পরে আসিতেছি।"

সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন ? তিনি প্রথমতঃ একটি বৃক্ষাবৃত কুটিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার পর তাঁহার পূজার গৃহে গেলেন। সে স্থানে কালিমাতার প্রতিমূর্ত্তি ছিল। তাহার সেই লক্ লক্ জিহ্বা আলুলায়িত কেশদাম ও মুণ্ডমালা দেখিয়া সন্ন্যাসিনী আজ চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু যাহারা নিজ অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত তাহাদের আর ভয়ের কারণ কি ? তখন তিনি সেই প্রতিমূর্ত্তি-হস্ত-স্থিত খড়্গ লইলেন ও বালিকার উদ্দেশ্যে আবার ফিরিলেন।

বালিকা প্রথমতঃ সেই মৃতদেহকে স্পর্শ করিতে ভীতা হইয়াছিল কিন্তু সেই মৃতদেহের অভ্যন্তরে কোন ঐশী শক্তি যেন মলিনাকে টানিতেছিল। মলিনা তখন শুনিল যেন সেই মৃতব্যক্তি বলিল "আয় মলিনা বিজয়ের সঙ্গে আয়।"

মলিনা মৃতদেহের পার্শ্বে শয়ন করিল তাহার পর সেই মৃতদেহ-টীকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল। মলিনা সেই নিমীলিত আঁখিদ্বয় আর মেলিল না।

আসিবে না।

আবার আসিবে পাখী অমিয় সুষমা মাখি
পুনঃ গাবে মধুমাখা গান
আবার হাসিবে ফুল মাতাইবে অলিকুল
ভেঙ্গে দেবে সব অভিমান।
গগনে হাসিবে তারা উজলিবে বসুন্ধরা
পুলকিত হইবে ভুবন।
সুগন্ধ মলয় আসি বিতরিবে গন্ধরাশি
তৃপ্ত হবে জগত পরাণ।
মধুর বসন্তকাল লয়ে কিশলয়দল
করিবে রে পুনঃ আগমন
মনোহর তরুরাজি ফুলফল সাজে সাজি
বসন্তে করিবে আবাহন।
হায়! এই মধু মাসে সে ত' আর নিজাবাসে
আসিবেনা ফিরিয়া আবার
পুন নিজ সাথীমাঝে বসিবে না প্রতি সাঁঝে
গাহিবে না মধুর মল্লার।

শ্রী—

"মামা ও ভাগ্নে"

গ্রীষ্মের বন্ধের পনের দিবস পূর্ব্ব হইতে মামা ভাগ্নে দুই জনে নানাপ্রকার সাজসজ্জা আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এই পনের দিবস কোনক্রমেই অতিবাহিত হইতে চায় না। ক্লাশে বসিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও আজকাল পড়াতে মন বসাইতে পারি না। ঘন ঘন

জল তেষ্টা পায় ও বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হয়। এই প্রকারে আরও ছয় দিবস অতিবাহিত করিলাম; কিন্তু এই ছয় দিবস যে কি প্রকারে কাটিয়া গেল তাহা বলা আমার সাধ্যাতীত। এবার মামাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যাইব এই আনন্দে রাত্রিতে আমার ভাল রূপ ঘুম হয় না। হঠাৎ স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠি। মনে কোন প্রকারেই শান্তি পাই না। আমার মন এতই বাড়ীর জন্য উদ্বিগ্ন যে লেখাপড়া ত' দূরের কথা, খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত ভাল লাগিতে ছিল না। মামাকে বলিলাম "এখন ত আর ক্লাশে পড়া শুনা তত হয় না, চলুন সাত দিবস পূর্ব্বেই বাড়ী যাই।" মামাও তাহাতে মত দিলেন। সেই রাত্রিতেই যাইবার সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু নিদ্রা আসিতেছিল না। মনের ভিতর নানা প্রকার ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। আমি এটার কিছু ওটার কিছু সেটার কিছু এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে কোন সময় যে নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম বলিতে পারি না। তবে দুইটার পূর্ব্বে নিশ্চয় নহে; এটা বলিতে পারি। কেননা দুইটা বাজিবার শব্দ আমার কাণে পৌঁছিয়াছিল। অন্যান্য দিবস আমি রাত্রি নয়টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে শয়ন করিতাম ও আটটার পূর্ব্বে কখনই শয্যাত্যাগ করিতাম না। কিন্তু সেইদিন ঘড়ির ঠং ঠং শব্দে যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল চাহিয়া দেখিলাম ঘড়িতে পাঁচটা মাত্র বাজিয়াছে। অন্য দিবস হইলে আবার নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু অদ্য তাহা হইল না। শয্যাত্যাগ করিলাম এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বিছানাপত্র গুছাইতে লাগিলাম। বিছানাপত্র গুছাইয়া মনে করিলাম এখনও দশটা বাজিতে দেরী আছে একটু বেড়াইয়া আসি কিন্তু আবার তখনই সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলাম এবং এটা ওটা সেটা করিতে করিতেই দশটা বাজিয়া গেল। নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও মামার সহিত ক্লাশে গেলাম কিন্তু থাকিতে

পারিলাম না। ঘণ্টা দুই ক্লাশে থাকিয়া ছুটী লইয়া ছাত্রাবাসে ফিরিয়া আসিলাম। ছয়টার সময় ট্রেণ কিন্তু আজ আর পাঁচটা বাজিতে চায় না চারটা বাজিল। আমার আর সহ্য হইল না, মামাকে তাড়া দিতে লাগিলাম। মামার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মামাকে সঙ্গে করিয়া পাঁচটার সময় ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসনে দেখিলাম প্রায় দেড় শত লোক উপস্থিত। অধিকাংশই যাত্রী, একবার মনে করিলাম আজ আর এত ভিড়ে যাইব না। কিন্তু তখনই আবার মনে হইল যে দিন যাইব সে দিন হয়ত আবার এই প্রকার ভিড় হইতে পারে অতএব আজই যাওয়া উচিত! আর বেশী দেরী না করিয়া গন্তব্য স্থানের দুইখানা টিকেট ক্রয় করিলাম, এবং প্ল্যাট-ফর্ম্মে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, গাড়ী আসিতে দেরী হইতেছে কেন? প্রত্যেক বিভাগেই দেরী হইলে জরিমানা দিতে হয় কিন্তু এই বিভাগটা এতই খারাপ যে দেরী করিলেও কিছু হয় না। মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইতেছিলাম ; এমন সময় আমার কাণে কিরি কিরি টিং টিং শব্দ প্রবেশ করিল। মুখ ফিরাইয়া দেখি একজন জমাদার গাড়ী অপর ষ্টেশন হইতে ছাড়িয়াছে তাহাই জ্ঞাপন করিল ও দুই পদ অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল "ডাঁক্ গাড়ী ছোড়া হো, ও জমাদার।" প্রাণে আশা হইল একটু স্ফূর্ত্তিও যে না হইল এমন নহে। কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিয়া আসিয়া প্ল্যাট-ফর্ম্মে দাঁড়াইল। ছয় মাইল পথ এক দৌড়ে আসিয়া ক্লান্ত ও পরি-শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বোধ হয় সেই জন্যই সে হাঁফাইতে লাগিল। বেটা, যেমন পরিশ্রমী তেমনই পেটুক। "ষ্টেশনে যতগুলি লোক ছিল সমস্তই পেটের মধ্যে পুরিল।" আমি অনেক পেটুকের নাম শুনিয়াছি ও পেটুক নামধারী দুই একজনকে দেখিয়াছি কিন্তু এমন পেটুক আর দ্বিতীয়টী দেখি নাই। আর না আর না করিয়াও পাঁচ সের রসগোল্লা স্বরূপ পাথুরিয়া কয়লা গালে পুরিয়া খানিকটা জল

খাইল ; তারপর একটা লোহার গুলির মুখসুদ্ধি লইয়া বিদায় লইল। অতি কষ্টে মামাকে লইয়া ট্রেণে উঠিয়া জিনিষ পত্র সমস্ত উঠান হইয়াছে কিনা দেখিতে লাগিলাম। সমস্ত জিনিষ পাইলাম কিন্তু লণ্ঠন বেচারাকে পাইলাম না সে আমাদিগকে ঠণ্ঠন দেখাইয়াছে। তখন আমার সেই প্রবাদটী মনে পড়িল।

"বাড়ী মুখে বাঙ্গালী ধায়
কার মুখে কি ফিরে চায় ?"

অতি কষ্টে ট্রেণে উঠিয়াছি কিন্তু বসিতে পারিতেছি না। মামা একটী গান ধরিলেন, তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া কয়েক জন ভদ্রলোক একটী বসিবার স্থান দিল। মামা বসিয়া বলিলেন "এই ছোকরাটী বেশ গাইতে পারে, তখন তাঁহারা আমাকে বসিরার জন্য একটী স্থান দিলেন এবং গান করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি নানাপ্রকার কারণ দর্শাইয়া বলিলাম আমার গান আপনাদের মনোমত হইবে না। কারণ আমার গলা ভাঙ্গিয়াছে ও কাশি হইয়াছে ইত্যাদি। ইতি মধ্যে মামা আর একটী গান ধরিলেন। আমি গান গাহিবার হাত হইতে রক্ষা পাইলাম। একটীর পর আর একটা তার পর আর একটী এই প্রকার গান চলিতেছিল। শিলংমেল ঠকাঠক ঠকাঠক শব্দে ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়া আসিয়া সান্তাহারে পৌঁছিল। আমরা গাড়ী বদলাইয়া নূতন গাড়ীতে চাপিলাম। আমরা যে কামরাতে উঠিলাম সেইটাতে আমাদের সমবয়স্ক একটি ভদ্রলোক ছিলেন।

তিনি আমাদিগের নাম ও কোথায় থাকি কি করি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা আমাদিগের পরিচয় যথাযথ দিলাম ও তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন আমার নাম হরেন্দ্র নাথ দত্ত, আমি রাজসাহীতে পড়ি,—কলেজে, সেকেণ্ড ইয়ারক্লাশে, নওগাঁ এসেছিলাম। এখানে আমাদের বাড়ী আছে, রাজসাহীতে ও আমাদের বাড়ী আছে, যাচ্ছি ক্যালকাটা। এতগুলি

কথা বলিবার কারণ আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম আমরা থার্ড ক্লাশে পড়ি। তিনি সেই ভদ্রলোকটীর প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন"—ইনি কে তা জানিস ইনি সেকেণ্ড ইয়ারে পড়েন। আমি গাড়ীতে উঠিয়াই আবার বাড়ীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলাম বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম "কি রকম ?"

মামা আরম্ভ করিলেন "হরেন ও ধরেনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। হরেন ধনীর সন্তান, ধরেন দরিদ্রের সন্তান, ধরেনের বিবাহ। তাহার ভাল গায়ের কাপড় না থাকায় সে হরেনের নিকট হইতে একখানা সাল লইয়াছিল। বরযাত্রীদিগের নামের মধ্যে হরেনের নাম দিল না সে জন্য সে বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। ধরেন তাহা শুনিয়া তাহাকে বরযাত্রীর মধ্যে লইল।

বিবাহের দিবস পূর্ব্বাহ্নে বর, বরযাত্রীদিগের সহিত বসিয়া তাস খেলিতেছে এমন সময় একজন কন্যাযাত্রী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বর কোথায় ?" হরেন লাফাইয়া উঠিয়া একটু হাসিয়া অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিল "ঐ যে মহাশয় সাল গায়ে বসিয়া আছেন উনিই বর আর ঐ যে সালখানি উহার গায়ে দেখিতেছেন ও খানি আমারই বলিয়া মামা সেই ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া দিতেই তিনি চটিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম মশায় এত গল্প বই নয়, চটেন কেন ? ভদ্রলোকটি আর প্রতিবাদ করিল না। মামা বলিতে লাগিলেন—সেই কন্যাযাত্রীটী গিয়া অপরাপর সকলের নিকট উক্ত ঘটনা বলিলে তাঁহারা দল বাঁধিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বর কোথায় ?" এবার হরেন উঠিয়া বলিল "মহাশয় ও যে সাল গায়ে ভদ্রলোকটি বসিয়া আছেন, বোধ হয় আপনারা দেখিতে পাইতেছেন, উনিই বর আর ঐ যে সালখানি উহার গায়ে, ওখানি এবার উহারই, আমার কখনই নয়; কারণ ইতিপূর্ব্বে ওখানা আমার বলায় আমাকে এই বরযাত্রী মহোদয়গণ গালি দিয়াছেন।" তাহার কথায় কন্যা-

যাত্রীর দল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হরেন বলিয়া উঠিল "পৃথিবীতে কোন সালার কথা না শোনাই ভাল।"

আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত ভদ্রলোকটি মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিলেন। মামার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না; কারণ আমরা দুই জন। তখন আমার মনে হইল "মামা ভাগ্নে যেখানে বিপদ নাই সেখানে।"

শ্রীভাগ্নে—

"ধর্ম্মহি সুখস্য মূলং"

তুমি পাপী। তোমার হৃদয় পাপে ভরা; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া বেড়াও সুখের একটু কণা মিলিবে কি? কোথাও না কিছুতেই না। সুখ কি জিনিষ, তাহা তুমি ধারণায় আনিতে পার না। শান্তির সুধাবারি কত তৃপ্তিদায়ক তাহা তুমি অনুভব করিতে পার না। প্রকৃত সুখ ও প্রকৃত শান্তি তোমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞেয়। এ জগৎ তোমার পক্ষে তীব্র জ্বালাময়। দগ্ধ তরুর ন্যায় তুমি নিরন্তর তাপে দগ্ধ হইতেছ। দিবা, রাত্রি, প্রহর, দণ্ড, পল, অনুপল এমন কখনও অবকাশ নাই, যে মুহূর্ত্তের জন্য তুমি জ্বালার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার। তুমি কেবল পুড়িয়া মরিতেছ,—কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছ কি? কিসে সুখ লাভ করিতে পারিবে; কিসে শান্তি ফিরিয়া আসিবে তদ্বিষয়ে কারণ জিজ্ঞাসু হইতেছ কি? যদি জানিতে অভিলাষী হও, তবে উত্তর পাইবে "ধর্ম্মহি সুখস্য মূলং"—অর্থাৎ সংসারে ধর্ম্মই সুখের একমাত্র কারণ। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে তুমি অন্য কোন প্রকারেও সুখের প্রত্যাশা করিতে পার না। ভৌতিক সুখ নানাপ্রকারে লাভ করিতে পাও বটে; কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী

আর ধর্ম্মজনিত সুখ অক্ষয় ও অবিনশ্বর। তোমার যথেষ্ট বিদ্যা-বুদ্ধি থাকুক, অতুল বৈভবের অধিকারী হও, অধর্ম্মসংশ্লিষ্ট হইলে কিছুতেই সুখ লাভ করিতে পারিবে না। কেননা প্রকৃত সুখ পার্থিব ঐশ্বর্য্যে কিম্বা তুচ্ছ বিদ্যা বুদ্ধিতে আবদ্ধ নহে, প্রকৃত সুখ ধর্ম্মলব্ধ। অতএব যদি প্রকৃত সুখ চাও তবে হৃদয় হইতে পাপরূপ বিষবল্লী উন্মূলিত করিয়া ধর্ম্মের বীজ বপন কর দেখিবে সময়ে সুফল ফলিবে। সুখ জন্মিবে, শান্তি আসিবে পবিত্রতা লাভে সমর্থ হইবে। নতুবা অনন্তকাল ধরিয়া সুখান্বেষণ কর; তোমার কামনা পূর্ণ হইবে না, সমস্ত যত্ন নিষ্ফল হইবে।

তুমি শরীর, মন ইত্যাদি সমস্তই পাপে গড়িয়া তুলিয়াছ। তোমার অস্থি, মজ্জা প্রতি অণু পরমাণুতে পাপ মিশ্রিত আছে। তোমার এ নির্ম্মাণ সুদৃঢ় হইতে পারে না। অচিরেই তোমার পতন আরম্ভ হইবে; তোমার ধ্বংশ অনিবার্য্য। আর, হৃদয়ে ধর্ম্ম-ভিত্তি স্থাপন কর, চিত্ত, মন এবং দেহকে ধর্ম্মের উপকরণে গঠিত কর; দেখিবে এ নির্ম্মাণ বহুকাল স্থায়ী হইবে। তুমি প্রকৃত উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবে এবং ধর্ম্ম তোমাকে ক্রমে উন্নীত করিয়া পরিশেষে তোমাকে অবিনশ্বরত্ব প্রদান করিবে। নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক জ্যোতি লাভে সমর্থ হইবে। ধর্ম্মাচরণই যথার্থ সুখাবহ। অতএব যদি যথার্থ সুখ লাভে তোমার অভিরুচি থাকে তাহা হইলে ধর্ম্মপথ অবলম্বনই সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর।

(পাগলের উক্তি)

"কল্যাণং কুরুতাং জনস্য ভগবাংশ্চন্দ্রার্দ্ধচূড়ামণিঃ" ॥৹

যমুনা বক্ষে।

ক্ষুদ্র নৌকাখানি স্রোতের বিরুদ্ধে ক্ষেপণী নিক্ষেপে চলিতে লাগিল। আমিও আমার কতিপয় বন্ধু 'যমুনাবক্ষে', নৌকারোহণে চলিয়াছিলাম। নদী বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অল্লায়াসে অপর পার দৃষ্টিগোচর হয় না। অপর পারস্থিত বৃক্ষরাজি ক্ষীণ নীল রেখার ন্যায় নীল নদীর সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। নীলে নীল মিশিয়া সীমান্ত প্রদেশ গভীর নীলিমাময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছিল, এবং নদী অসীম, অনন্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল।

তখনও সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করেন নাই। স্বর্ণচ্ছটায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ মালাকে অলক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া 'যমুনাবক্ষে' প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। মৃদুমন্দ সমীরণে তরঙ্গরাজি খেলা করিতেছিল। তাহারা সকলেই রত্নরাজিতে অলঙ্কৃত ছিল। তরঙ্গ খেলা করিতেছিল, সূর্য্যপ্রতিবিম্ব নদীবক্ষে কাঁপিতেছিল। পুলকে চাঞ্চল্যে একত্র একটি তরঙ্গ যেন সূর্য্য প্রতিবিম্ব লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছিল। যেন একখানি বিস্তৃত বস্ত্র বায়ুদ্বারা ঢেউ খেলিতেছিল। তাহারা সকলেই এক খেলায় মগ্ন। কোথায় যে মিশিয়া যাইতেছিল, তাহার স্থিরতা ছিল না। নৌকাখানি আবার সেই তরঙ্গ দলিয়া উজান বহিয়া যাইতেছিল। ইহাতে তাহাদের খেলার কোন ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল কিনা তাহা জানিনা। বোধ হয় কোন বিঘ্ন জন্মিয়াছিল, কারণ তাহারা প্রতিহিংসা লইতে ত্রুটি করে নাই। তাহারাও নৌকাখানিকে আঘাত করিল, তাহাতে নৌকা ভাঙ্গিল না কিন্তু ভয় পাইল।

জলের উপর দিয়া পানকৌড়ীর দল যাইতেছিল তাহাদের পক্ষনিপাতনে শোঁ শোঁ শব্দ হইতেছিল। তাহারা একবার উর্দ্ধে একবার নিম্নে নামিতেছিল। কিন্তু সকলেই সমতানে ও একসঙ্গে, যেন কাল একটা জন্তু জলের উপর দিয়া লাফাইয়া চলিয়াছে! কিছু

দূরবর্ত্তী হইলে কাল একটি রেখার মত হইয়া অপরপ্রান্তে জলের সহিত মিশিয়া গেল। তাহাদের সরলতা, নিরভিমান স্বভাব, প্রাণের ভিতর একটা রেখা রাখিয়া গেল। তাহাদের সবই কাল—পক্ষ কাল, চক্ষু কাল, শরীর কাল, তবুও কি বিশ্ববিমোহন ছবি। আমাদের চক্ষে কাল, বিশ্বের চোখে সবই সমান। তাই কাল করে জগত আলো কালোয় নিয়ে কাল থাকে, ভালয় নিয়ে ভাল থাকে। কাহারও জন্য কাহারও কাজ অসম্পূর্ণ থাকেনা, সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম সমাপন করিয়া আপনার গন্তব্য পথে চলিয়া যায়। তাহাদের সরলতা ভুলিতে পারিলাম না। যতক্ষণ পারিলাম, ততক্ষণ তাহাদের সুমধুর স্মৃতি হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া বিস্তর আনন্দানুভব করিলাম।

বেলা বয়ে যায় সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে কুলায় প্রত্যাবর্ত্তমান বিহঙ্গ-কুল তাহা ঘোষণা করিল। তাহাদের কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইল। প্রকৃতির শিশু ইহারা প্রকৃতি ইহাদিগকে স্নেহের চোখে দেখে প্রকৃতির ক্রোড়েই লালিত পালিত। কেমন পরস্পরে পরস্পরের সহিত মিশিয়া চলিয়াছে। দিবা ও রাত্রির সঙ্গমস্থলে প্রকৃতির কি রূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে তাহা যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই অনুভব করিতে পারেন। আমি কাগজে কলমে সমালোচনা করিতে অসমর্থ।

ক্রমে সূর্য্যরথ পশ্চিমে অস্তাচলে পৌঁছিল। সমস্ত বিশ্ব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। খদ্যোদগণ ক্ষীণ আলো বিস্তার করিয়া তট-স্থিত বৃক্ষের অন্তরালে খাদ্যের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল। নৌকা উজান বাহিয়া চলিতে লাগিল। অন্যান্য তরীর ক্ষেপণী নিক্ষেপে ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ হইতেছিল। নৌকার মধ্যস্থিত আলোক ক্ষুদ্র জানালা পথে নির্গত হইয়া সেই অন্ধকারে আপন অধিকার বিস্তার করিল এবং তরঙ্গায়িত সলিলোপরি পতিত হইয়া এক

অপূর্ব্ব জ্যোতি বর্দ্ধন করিতেছিল। কৃষকগণ সপ্তস্বরে নিজ নিজ বাড়ীতে শান্তিতে গান করিতেছিল। সমস্তদিন কঠোর পরিশ্রমের পর বিশ্রাম সুখ লাভ করিতেছিল। সমীরণ তাহাদের সঙ্গীতধারা বিধাতার চরণতলে ঢালিয়া দিতেছিল। সে সঙ্গীত আমাদের কর্ণে অমৃতবৎ প্রবেশ করিয়াছিল।

পেচকের কর্কশ শব্দ রজনীর গম্ভীরত্ব প্রকাশ করিল। যমুনার জলকল্লোল ঘুমন্ত প্রকৃতির বেদনা ভার বহিয়া আনিতেছিল। নৈশ নিস্তব্ধতা পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল নিজ অঙ্কে স্থান দিয়াছিল। যমুনার সঙ্গীত নৈশ সমীরণে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। ক্রমে পূর্ব্বাকাশে ক্ষীণ হাসিরেখা দেখা দিল। ইন্দুর বিম্বাধর ফুটিয়া অলক্তরাগে সে হাসি রাশি সর্ব্বাগ্রে যমুনা বক্ষে বিকীর্ণ হইল। গগন তিমিরাচ্ছন্ন ছিল, জ্যোৎস্নার হাসিতে হাসিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘমালা দৃষ্ট হইল। সে হাসিরাশি গগনে ধরিল না, অবশেষে নদী সৈকতে পড়িয়া ঝিকিমিকি করিতেছিল। যমুনার জল উজ্জ্বল হইল, যমুনাবক্ষ স্ফীত হইল। বায়ু যমুনার তরঙ্গদিগকে নাচাইয়া যমুনার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘমালা গগনে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। ক্রমে ক্রমে সকলে একত্র হইয়া গগনের আবরণ হইল। বিস্তৃত একখানি মেঘচর্ম্ম যেন ইন্দুকে আবৃত করিল। ইন্দুর যেন ধবল হাসি ম্লান হইল সে হাসি আর যমুনা বক্ষে পৌঁছিতে পারিল না।

অদূরে কুঞ্জবনে পাপিয়া পঞ্চম সুরে গগন প্লাবিত করিতে লাগিল। ইন্দু মেঘমুক্ত হইল যমুনা জল সহসা হাঁসিয়া উঠিল পাপিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া আরও উন্মত্ত হইল। আমাদের নৌকার উপর দিয়া আমাদের মাথার উপর দিয়া চোখ গেল পাখি চোখ গেল চোখ গেল বলিতে বলিতে যাইতে লাগিল। ইন্দুকিরণ যেমন ব্রহ্মাণ্ড ভাসাইতেছিল পাপিয়ার সুমধুর সঙ্গীত ও তেমন আমার হৃদয়-

গগন ভাসাইয়া দিতে লাগিল। আবেগ উচ্ছ্বাসে অন্ধ হইলাম। প্রাণের ভিতর বিদ্যুতপ্রবাহ ছুটিল, সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের গন্ধে বায়ু যেরূপ ক্ষেপিয়া উঠে, যেরূপ উন্মত্ত হয় আমারও মন সেইরূপ উন্মত্ত হইয়াছিল। নৈশ নব পল্লবে মুক্তার শিশির বিন্দু ঝলমল করিতেছিল তাহাও আমার মনে আনন্দ দান করিতে পারিতে ছিলনা। পাপিয়া গানে মত্ত, তার সঙ্গীত ধারায় গগন ভাসিয়া গেল। আমার হৃদয় তার গানের অভাবে মরুভূমির মত শুষ্ক হইতে লাগিল। সেত আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে উড়িয়া গেল কেবল নৈরাশ্য তিমিরে পড়িয়া রহিলাম আমি। আমার যদি পাখা থাকিত আমি তাহার সহিত উড়িয়া বেড়াইতাম। তাহার গানে মনের তৃপ্তি সাধন করিতাম। এই নৈরাশ্যের রেখা রাখিয়া সে উড়িয়া গেল। এ রেখা শীঘ্র মুছিল না দেখিয়া হৃদয় পুরিয়া রাখিলাম কেবল কল্পনাতেই সুখী হইতে লাগিলাম। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একটী সুখময় স্বপ্ন বুকে লইয়া ঘুমন্ত প্রকৃতির সহিত যোগ দিলাম। দেখিলাম, আমি যাহার জন্য সাশ্রু নয়নে ঊর্দ্ধে তাকাইয়া ছিলাম সেই প্রাণ প্রিয়তম পাখীটি আমার হস্তের উপর বসিয়া আমাকে সুমধুর গান শুনাইতেছে। তাহার সুমধুর সঙ্গীত লহরী মেঘলোক স্পর্শ করিল। আমি সেই সঙ্গীত তরঙ্গে যেন ভাসিতে লাগিলাম। আমার মনে হইয়াছিল আমি যেন পৃথিবীতে নাই। স্বর্গের কোন নিগূঢ় আনন্দময় স্থানে ছিলাম। এখনও সেই সঙ্গীত আমার কর্ণকুহরেধ্বনিত হয় এবং যতকাল বাঁচিয়া থাকিব ততকাল হইবে। কখনও ইহা ভুলিতে পারিব না। এখনও সেই সঙ্গীত মনে হইলে আমার শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটে। এখনও আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়। আমি সেই গানে বিভোর হইতেছিলাম। হায়! অধিকক্ষণ এই সুখ স্বপ্নটী আমার বক্ষে স্থান পাইল না। যখন নব সূর্য্যের বালার্ক কিরণ আমার অঙ্গ স্পর্শ করিল এবং বিহঙ্গকুলের

কলনাদে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল, সেই সময় আমার সুখময় স্বপ্নটী কোথায় বিলীন হইয়া গেল। স্বপ্নটী চলিয়া গেল কোন ক্ষতি হইল না কেবল একটী অভাব রাখিয়া গেল। এ অভাব আর পূর্ণ হইবে না। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম নৌকাখানি ঘাটে বাঁধা আছে। ক্ষণ পরে আবার পাখীর কথা মনে পড়িল, আমার মনে হইল যেন বুকের ভিতর কোন স্থান শূন্য হইয়াছে। আবার কেবল কল্পনাতেই সুখী হইতে লাগিলাম। যখনই আমার মনে এই সমস্ত উদিত হইত তখনই আমার মন অপার আনন্দ রসে আপ্লুত হইত। এমন নৈসর্গিক আনন্দও আমার ক্ষুদ্র জীবন নাটকে উপভোগ করিয়াছি।

অঞ্জলি

"আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা॥"

১ম বর্ষ	চৈত্র, ১৩২৪, বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়, ১৩২৫	৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা।

(গান)

তোমারি তরে মা এনেছি আজিকে ভরিয়া আমরা
কুসুমাঞ্জলি;
তোমারি পূজাতে সঁপেছি আমরা মোদের ক্ষুদ্র
পরাণগুলি।

বহুদূর হ'তে শুনেছি তোমার,
ঝন্ ঝন্ ঝন বীণা-ঝঙ্কার,
বহুদূর হ'তে এসেছি ছুটিয়া লভিতে তোমার
চরণ-ধূলি।

ঘুমায়ে ছিলাম অন্ধ ভবনে
পশিল সহসা আহ্বান শ্রবণে
দেখিনু ধরণী উজল কিরণে, আসিনু ছুটিয়া
আপনা ভুলি'।

তুমি বুঝি মোর সাধের অর্ঘ্য নেবেনা,
তুমি বুঝি তারে সজীব করিয়া দেবেনা,
মম অন্তর-মাঝে শূন্য-বেদনা, থমকি থমকি
উঠিবে দুলি'।

"বাঁধন"

(১)

চন্দ্রনাথের ছোট-ভাই মানু তখন সবে মাত্র পাঁচ বছরে পা দিয়াছে। চন্দ্রনাথ সেইবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল—তখনও ফল বাহির হয় নাই—কাজেই হাতে কোন কাজ ছিল না; তাই চন্দ্রনাথ তাহার ছোট ভাইটীকে লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিল। ইচ্ছা তাহাকে একটা মানুষের মতন মানুষ করিয়া তুলিবে।

সন্ধ্যা হইলেই গম্ভীর ভাবে আদেশ করিত, "মানু, হাত পা ধুয়ে পড়্‌তে বস—আজ যদি পড়া বল্‌তে পার তবে "জল পড়ে পাতা নড়ে" তোমায় নূতন পড়া দিব—আর না পার্লে বুঝতেই পার্চ্ছ তোমার কপালে কি আছে। তাহার ছোট ভাইটীও তাড়াতাড়ি হাত পা ধুইয়া অনেক ক্ষণ খুঁজিয়া খাটের তল হইতে অথবা তাহার দাদার রাশিকৃত পুস্তকের মধ্য হইতে একখানি অৰ্দ্ধছিন্ন প্রথম ভাগ বাহির করিয়া সাম্নে খুলিয়া বসিত। কিছুক্ষণ 'রতন' 'সাগর' ইত্যাদি চিৎকার করিয়া পড়িত। তারপর সেই ঘোর সন্ধ্যার সময়েও তাহার প্রিয় পদ্যটী আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিয়া দিত—

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল
ইত্যাদি।

তারপর ঘুমে ঢুলিতে থাকিত।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রনাথ ভাত খাইয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে সেই ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিত "কি, ঘুমান হচ্ছে বুঝি?"

তারপর প্রথম ভাগ খানি তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "বলত মানু, "হাতী" বানান কি?" 'হয়ে দীর্ঘাকার 'হা'—আর 'ত' য়ে

আকার 'তী'=হাতী। চন্দ্রনাথ গম্ভীর ভাবে বলিত আজ পড়া শেখনি, আচ্ছা এবার তোমাকে ক্ষমা করা গেল—এর পরের বারে আর তা হবে না কিন্তু—বুঝেছ ?" "বুঝেছি দাদা, দাদা একটা গল্প বল না" "গল্প ? কিসের গল্প শুন্‌বিরে ? প্রহ্লাদ ?"

"নাঃ ওসব পুরোনো গল্প শুন্‌ব না, আর একটা ভাল গল্প বল।"

তাহার দাদা তখন চিৎ হইয়া শুইয়া বালক ধ্রুবের গল্প বলিতে আরম্ভ করিত। ধ্রুবের কাহিনী শুনিতে শুনিতে মানুর চক্ষুতে জল ভরিয়া আসিত—সে তাড়াতাড়ী তাহা কোঁচার খুঁট দিয়া মুছিয়া ফেলিত পাছে তাহার দাদা দেখিয়া ফেলে।

এমনি করিয়া তাহাদের সময় কাটিয়া যাইত, চন্দ্রনাথের ইচ্ছা—তাহার ভাইকে একটা মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিবে। তাই সে নিয়ম করিয়া দিয়াছিল মানু প্রাতঃকালে দুই ঘণ্টা, দ্বিপ্রহরে একঘণ্টা ও সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা পড়িবে। মানুও তাহার দাদার আদেশ পালন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিত—কিন্তু সকাল বেলা হাত মুখ ধুইয়া বই লইয়া বসিতেই ওবাড়ীর পটলা আসিয়া ঘরে উঁকি দিয়াই বলিয়া উঠিত, "কি মানু, পড়্‌তে বসেছিস্ বুঝি ? আজ বিয়েতে তুইই যে বরকর্ত্তা—যাবিনে ? মানুর শিশু-হৃদয় বাধা মানিত না—সে এদিক ওদিক দেখিয়া এক ছুটে বাড়ীর বাহির হইয়া যাইত।

চন্দ্রনাথ চাহিত তাহার ভাইয়ের হৃদয়ে এমন একটা বীজ বপন করিয়া দিতে যাহার ফলে ভবিষ্যতে সকলেই মুগ্ধ, চমৎকৃত হইয়া যাইবে—মানু কিন্তু বাল্যের চাপল্যে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না।

(২)

সেদিন বিকাল বেলায় চন্দ্রনাথ বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে এক জায়গায় দেখিল অনেক লোক দাঁড়াইয়া

আছে। আর দেখিল তাহারই সহপাঠী কুমুদরঞ্জন সেই জনতার দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া কি যেন বলিতেছে। তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া শুনিল সেই অসংখ্য লোককে সম্বোধন করিয়া কুমুদ-রঞ্জন বলিতেছে—

"বন্ধুগণ, একবার ভেবে দেখ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সেই শৌর্য্য বীর্য্যের কথা। ভেবে দেখ কেমন করে তাহারা জননী জন্মভুমির জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অম্লানবদনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন— তোমরা তাদেরই বংশধর—তাদেরই রক্ত তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। তোমরা বীরের সন্তান।

চেয়ে দেখ জননী তোমাদের পানে ব্যাকুল নয়নে চেয়ে আছেন—তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা কর্চ্ছেন। কে আছ বীরের সন্তান—কে আছ স্বদেশপ্রেমিক—এই মহেন্দ্রক্ষণে ইংরাজ-রাজকে যুদ্ধে সাহায্য করে প্রকৃত দেশের কাজ কর।"

চন্দ্রনাথ দেখিল কুমুদরঞ্জনের মুখ-মণ্ডলে কি একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি ঝলসিত হইয়া উঠিয়াছে—সে একটা অপূর্ব্ব মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। চন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল। তারপর চন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিল না তাহার কি হইয়া গেল—সে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "হাঁ ভাই আমিও যাব"। কুমুদরঞ্জন ধীরে ধীরে আসিয়া চন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল "বল ভাই, বন্দে-মাতরম্—বন্দে-মাতরম্—বন্দে-মাতরম্।

* * * *

চন্দ্রনাথের পিতা হরিনাথ ভট্টাচার্য্য গ্রামস্থ জমিদারের নিকট ২০৲ টাকা বেতনে মুহুরিগিরি করিতেন। হরিনাথ বাবুর স্ত্রী বছর ২।৩ আগেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সংসারে দুইটী পুত্রসন্তান ছাড়া আর কেহই ছিল না। তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহাদ্বারা কোনরূপে তাহাদের সংসার চলিয়া যাইত।

তিনি অনেক কষ্ট করিয়া এতাবৎকাল পর্য্যন্ত চন্দ্রনাথকে পড়াইয়াছিলেন। মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন চন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই তাহাকে জমিদারের অধীনে কোন একটী চাকুরীতে ঢুকাইয়া দিবেন। তাহা হইলেই তিনি শেষের দিন কয়টা নিশ্চিন্তে কাটাইয়া দিতে পারিবেন।

সন্ধ্যার সময় হরিনাথ তামাকু সেবন করিতেছিলেন। এমন সময় চন্দ্রনাথ বাড়ীতে ঢুকিয়াই ডাকিল "বাবা" ? "কি চন্দ্রনাথ ?" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চন্দ্রনাথ বলিল "বাবা, আমি যুদ্ধে নাম দিয়ে এসেছি।" হয়িনাথ বাবু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এঁ্যা, যুদ্ধে নাম দিয়ে এসেছ ? কি বল্‌ছ চন্দ্রনাথ ?" "সত্যি কথাই বল্‌ছি বাবা, যদি বলেন তবে কালই চলে যাই।" কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি না—আমার মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে—এমন কাজ কেন কর্ল্লে চন্দ্রনাথ ?

চন্দ্রনাথ উত্তরে কিছুই বলিল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিনাথ বাবু বলিতে লাগিলেন, "তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল চন্দ্রনাথ—আমি বুড়ো হয়েছি—আজ আছি কাল নাই—তার পর ছোট ছেলেটাকে কে দেখ্‌বে ?" চন্দ্রনাথ কি যেন বলিতে যাইতেছিল—বলিতে বলিতে চুপ করিয়া গেল। বৃদ্ধ হতাশভাবে আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "হুঁ, সংসারের নিয়মই এই" তারপর পুত্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন–"তোমার যা ইচ্ছা কর্‌তে পার—আমার কোন আপত্তি নাই।"

চন্দ্রনাথ নিজের অন্ধকার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িল—আজ নিজের কথা মনে পড়িতেই সে ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেল–সংসারের সব চেয়ে বড় সত্যটা সে আজ যেমন করিয়া অনুভব করিল এমন কোন দিনই করে নাই–ওহো কালই না ঠিক এমনি সময়ে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের কত রকম রঙ্গীন ছবি তাহার মানস পটে আঁকিয়া তুলিয়াছিল সে–কিন্তু

আজ? একটা ভস্মাবৃত, জটাজুটধারী সন্ন্যাসী পদাঘাতে তাহার সাধের খেলাগৃহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া তাহাকে অঙ্গুলী সঙ্কেতে আর একটা পথ দেখাইয়া দিল। আর সে মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই পথেই যাত্রা সুরু করিয়া দিল। তাহার কত সাধের খেলাঘরগুলির দিকে একবার দেখিয়া লইবারও অবকাশ পাইল না—শুধু একটা গোপন বেদনা তাহার অন্তরের গোপন প্রকোষ্ঠের মধ্যেই রহিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে সেই অন্ধকার শয়নকক্ষেই চন্দ্রনাথ কখন ঘুমাইয়া পড়িল—যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন দেখিল অনেক বেলা হইয়াছে—জানালা দিয়া তপনের প্রথম কিরণমালা তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—চন্দ্রনাথ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল—হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া দেখিল পিতা বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবা, আমি তবে আসি আট্‌টার সময় গাড়ী ধর্‌তে হবে"। হরিনাথ বাবু কিছুক্ষণ পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন তারপর বলিলেন, "সত্যিই কি যাবে চন্দ্রনাথ"? "হাঁ বাবা"। হরিনাথ বাবু কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন তারপর বলিলেন—"আচ্ছা যাও, কিন্তু মনে রেখো চন্দ্রনাথ যদি কোনো দিন ফেরো তবে আর এমুখো হয়ো না। চন্দ্রনাথ নীরবে বাহির হইয়া গেল। কিছু দূর গিয়াই দেখিল, মানু আর কতকগুলি বালকের সহিত খেলা করিতেছে—একবার ভাবিল মানুকে সব কথা বলিয়া যাই—আবার ভাবিল না দরকার নাই আবার হয়তঃ এখনই কি একটা গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিবে। কিন্তু মানু দূর হইতে দাদাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিল, বলিল, "এত সকালে কাপড় চোপড় পরে কোথায় যাচ্ছ দাদা?" "বেড়াতে যাচ্ছি মানু" "আমিও যাব"। না তুমি খেলগে—একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে অনেকটা দূর যেতে হবে"। দাদা তাহাকে সঙ্গে না লওয়াতে মানু মনঃক্ষুণ্ন হইয়া খেলিতে গেল।

চন্দ্রনাথ পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিষম সমস্যা যাহা তাহার মনটাকে চঞ্চল, উৎক্ষিপ্ত ও আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা এই—সে যে পথে চলিয়া যাইতেছে সেইটাই ঠিক পথ কিনা। তাহার হতভাগ্য পিতা, যে তাহাকে এই বিশ বৎসর ধরিয়া মানুষ করিয়াছে—নিজের মুখের গ্রাস তাহার মুখে তুলিয়া দিয়াছে—আজ সে তাহারই অতখানি আশার মূলে কুঠার ঘাত করিয়া দেশের সম্মান রক্ষার জন্য চলিয়া যাইতেছে। কেন সে কি দেশের মান অপমান ধুইয়া খাইবে। কি হইবে তাহার দেশের মান অপমান দিয়া ? তবে কি সে ফিরিয়া যাইবে ? তাহাদের সেই সুখময় গৃহ, স্নেহময় পিতার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য চন্দ্রনাথের মন আকুলি ব্যাকুলি করিতে লাগিল—কিন্তু থাক্, ওই পর্য্যন্ত—সে যে একটা সোণার সুদৃঢ় শিকলে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে—তাহার অজ্ঞাতসারে—সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে—ঐ সোণার শিকলটা ছিঁড়িয়া ফেলা তাহার সাধ্যে কুলাইবে কি ? না, না এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এটা তাহার সাধ্যের অতীত ॥

(৩)

যেদিন চন্দ্রনাথ যুদ্ধে চলিয়া গেল সেই দিন দ্বিপ্রহরে খাইতে বসিবার সময় মানু পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল।

"বাবা, দাদা যে এখনও এলনা—তার কোন বন্ধুর সঙ্গে নাকি দেখা করতে গেছে" পিতা প্রথমে কিছুই বলিলেন না, দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করার পর একবার ধমকাইয়া উঠিলেন "চুপ করে বসে খা পাজী—তোর দাদা কোথায় গেছে তার আমি কি জানি ?" মানু পিতার এইরূপ রুক্ষভাব দেখিয়া আর কিছুই বলিতে সাহস করিল না—সেদিন আর তাহার ভাল করিয়া খাওয়া হইল না—যেমন তেমন করিয়া দুটো মুখে দিয়া উঠিয়া গেল। সে কেবলই ভাবিতেছিল—কৈ তাহার বাবাত তাহাকে কোন দিন এমন করিয়া

ধমকায় নাই—তবে আজ এমন হইল কেন ? আর ইহার মধ্যেই বা রাগ করিবার কথা কি থাকিতে পারে ? তবে সে বুঝি কোন একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছে—কিন্তু কি যে করিয়াছে সে তাহা আকাশ পাতাল ভাবিয়াও ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। একবার ভাবিল সে সকালে উঠিয়া খেলিতে যায়, তাই বুঝি তাহার বাবা রাগ করিয়াছে। সে প্রতিজ্ঞা করিল আজ হইতে সে আর সকালে ও দুপুরে খেলিতে যাইবে না—সে কেবল বিকাল বেলায় খেলিবে—তারপর হাতমুখ ধুইয়া পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্লেট্ পেন্সিল লইয়া ১, ২, লিখিতে বসিয়া গেল।

আহারের পর তামাক সাজিয়া একটান দিতেই হরিনাথ বাবুর পুত্রের কথা মনে পড়িয়া গেল। আহা! আজ ছেলেটা ভাল করিবা খায় নাই। খাওয়ায় সময় ওরকম ভাবে ধমক দেওয়াটা ভাল হয় নাই—মা হারা ছেলে—বড় ভাইটাও ছেড়ে চলে গেল—ওর আর কে আছে—কে আর যত্ন করে খাওয়াবে। তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে গিয়া দেখিলেন প্রায় সমস্ত ভাতই পড়িয়া রহিয়াছে।

"মানু, ও মানু এদিকে শুনে যাও একবার। "যাই বাবা" মানু তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া আসিল। "আজ যে তোর একেবারেই খাওয়া হয় নাইরে—কেন বল দেখি ?" হরিনাথ বাবু পুত্রের মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

"কেন বাবা, আমি খেয়েছিত"। "কোথায় খেয়েছিস্‌রে, সব ভাত যে পড়ে রয়েছে—যা—যা হাত মুখ ধুয়ে আয়, আমি আরও ভাত দিচ্চি"। হরিনাথ বাবু পুনর্ব্বার ভাত বাড়িয়া দিলেন—মানু খাইতে লাগিল। তিনি তামাক খাইয়া কাপড় পরিতে পরিতে বলিলেন, "আমি ত আপিসে যাচ্ছি মানু, তুই আজ কোথাও যাস্ না—খেয়ে দেয়ে বাড়ীতেই খেলা কর্ বুঝলি।" "হাঁ বাবা বুঝেছি"। হরিনাথ

বাবু চলিয়া গেলেন। মানু ভাত খাইয়া হাত ধুইতেছে—এমন সময় পট্‌লা আসিয়া বলিল।

"কিরে মানু তোর দাদা নাকি লড়ায়ে গেছে ?"

"কিসের লড়াই রে ?" "কেন জর্ম্মণের লড়াই"

"দূর, দাদা তার একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেছে, অনেক দূর কিনা, তাই এবেলা আস্‌তে পার্ল্লে না—ওবেলা আস্‌বে"।

"তুই জানিস্ না তবে, তোর বাবা আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন—আমার বাবা জিজ্ঞাসা কল্লেন, "কি, ভট্‌চাযি মশাই, তোমার চন্দ্রনাথ নাকি যুদ্ধে গেছে ? তোমার বাবা বল্লেন, "দেখছ ভায়া, কলিযুগের ছোক্‌রাদের কাণ্ড—এতটুকু থেকে এত বড় কল্লুম—ছেলেবেলায় মা মরে গেল—মার মত কোলে পিঠে করে মানুষ কল্লুম—আর কত কষ্ট করে লেখাপড়া শেখালুম—তা তুমি জানইত মুখুয্যে ভায়া—এখন কিনা সেই ছেলে বুড়ো বাপ্‌কে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল—একবার ভেবেও দেখ্‌লে না তার বুড়ো বাপ্‌টার দশা কি হবে। এম্‌নি অকৃতজ্ঞ!" তারপর তোর বাবা রাগে গর্‌গর্ কর্‌তে কর্‌তে চলে গেলেন। বাবা কত ডাক্‌লেন আর ফির্‌লেন না।"

"এঁ্যা সত্যি দাদা লড়ায়ে গেছে—না তুই ঠাট্টা কচ্চিস্"। "ঠাট্টা কর্ব্ব কেন রে ? তোর বাবা যা বল্লেন, তাই বল্লুম।"

"ও বুঝেছি, বুঝেছি, তুই ঠাট্টা কচ্চিস্—দাদা আমাকে নিজে বলে গেল—একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্চি—না এ হতেই পারে না।"

"না হল ত না হল—তা—তা আমার কি ?"

"উঁহু এ হতেই পারে না—নিশ্চয়ই কেউ বাবার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে"

তাহার কথা বিশ্বাস না করাতে পট্‌লা রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

(৪)

মানু ডাকিল, "বাবা" "কি বাবা?" "দাদা, নাকি লড়াই কর্‌তে গেছে?" "এমন কথা তোকে কে বল্লেরে? "কেন পটলা"। পুত্রকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন হরিনাথ বাবু তাহাই সারারাস্তা ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলেন যাহা তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন তাহাই ঘটিতে দেখিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। পুত্রকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "যাক্ না মানু, গেছেত কি হয়েছে? আমরা দু'বাপ বেটায় মিলে খিচুড়ী পাক কর্ব্ব আর খাব—সে বেশ হবে কি বল মানু?"

"নাঃ সে কেমন হবে? দাদা না থাক্‌লে"—"বেশ হবে,—বেশ হবে—রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে আমি তোমাকে কত রাজ-রাজড়ার গল্প বল্‌ব—তুমি শুন্‌বে আর—"

"না, বাবা দাদা আমাকে কত ভাল ভাল গল্প বল্‌ত-কত ভাল ভাল জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেত তুমি আমাকে দাদার কাছে রেখে এস।"

পিতা বলিলেন—"সে কেমন করে হবে রে—সে যে অনেক দূর—আর সেখানেই বা কেমন করে যাবি?"

"খুব যাব বাবা—যখন হাঁটতে পার্ব্ব না তুমি কোলে করো।"

এত দুঃখেও হরিনাথ বাবুর হাসি আসিল—সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রনাথের প্রতি রাগের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল—হায় রে পাষাণ—এত খানি স্নেহের বাঁধন এমনি করে ছিড়ে ফেল্‌তে হয়!

তিনি পুত্রের চিন্তা অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য বলিলেন, "দেখ্‌বে মানু—তোর জন্য এক টা নূতন জামা এনেছি—দেখ্‌তো তোর গায়ে লাগে কিনা"। "দেখি" বলিয়া মানু হাত বাড়াইয়া দিল। মানু জামাটা গায়ে দিয়া বলিল, "এটা ঠিক লাগে বাবা—এইটে পরে আমি দাদার কাছে যাব" "আচ্ছা যাস্" মানু বলিল—সে কবে বাবা—কাল সকালে?"

"কাল সকালে কেমন করে হয় রে? ছুটি নিতে হবে যে"
"তবে কাল বিকালে, কেমন? "আচ্ছা কাল বিকালে।"

পরদিন দ্বিপ্রহরে খাওয়া দাওয়ার পর মানু বলিল, "বাবা, কাপড় চোপড় গুছিয়ে নাওনা শেষে সময় পাবে না।"

"আজত আর যাওয়া হয় না মানু—আমি চিঠি লিখে দিয়েছি তোর দাদা হয়ত ২।৩ দিনের মধ্যেই আস্‌বে।"

মানু নিশ্চিন্ত হইয়া আবার খেলিতে গেল।

হরিনাথ বাবু ভাবিতে লাগিলেন—যার উপর এত আশা ভরসা করিয়াছিলেন—সেত অসময়ে ফাঁকি দিয়া গেল—তাহারও প্রায় জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিল—এখন ছোট ছেলেটার ব্যবস্থা কি করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গ্রামস্থ জমিদারের নিকট কিছু টাকা ধার লইয়া ছোটো খাটো একখানি দোকান ফাঁদিয়া বসিলেন। গ্রামের অনেকের সঙ্গেই তাহার সদ্ভাব ছিল। চন্দ্রনাথ যুদ্ধে চলিয়া যাওয়াতে ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই তাহার প্রতি সহানুভূতি বশতঃ তাহার দোকান হইতেই জিনিষ পত্র লইতে লাগিল। তিন চারি মাসের মধ্যেই হরিনাথ বাবুর দোকান গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাভবান্ হইয়া উঠিল।

মানু মধ্যে মধ্যে ভয়ানক গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিত হরিনাথ বাবু পুত্রকে ভুলাইবার জন্য বলিতেন, "তোর দাদা আজ আসতে পার্ল্লে না কাল হয়ত আস্‌বে" পুত্রের নিকট এই রকম ছল চাতুরী তাহার মোটেই ভাল লাগিত না। মানু প্রায়ই কেন আসিল না—কবে আসিবে ইত্যাদি প্রশ্নে হরিনাথ বাবুকে বিব্রত করিয়া তুলিত। মাঝে মাঝে রাগ করিয়া খাইত না।

তাহাদের এখন অন্ন বস্ত্রের চিন্তা মোটেই ছিল না। তিনি দোকানের জন্য দুইজন গোমস্তা এবং নিজেদের পরিচর্য্যার নিমিত্ত দুইজন চাকর রাখিয়াছিলেন।

এমনি করিয়া ছয়মাস কাটিয়া গেল। মানু এখনও পিতাকে তাহার দাদার খবর জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়িত না। তিনি বলিতেন তাহার দাদা চাকুরী করিতেছে সেই জন্য আসিতে পারে না। মাঝে মাঝে মানুর শিশু হৃদয় তাহার দাদার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সে ভাবিত তাহার দাদা এখনও আসে না কেন? কেমন করিয়াই বা সে তাহাকে এতদিন ছাড়িয়া আছে। তাহার দাদা বুঝি তাহাকে ভালবাসে না।

(৫)

স্বদেশ হইতে দূরে—বহুদূরে—সুদূর প্রবাসে ফ্রান্সের কোনও একটা হাঁসপাতালে চন্দ্রনাথ আহত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার বাম হস্ত ও বামপদে গুলী লাগিয়াছিল। যাহাদের সঙ্গে সে আসিয়াছিল—কুমুদ—রমেশ, ইন্দ্র—তাহারা তাহার অনেক পূর্ব্বেই কোন এক অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে শুধু চন্দ্রনাথই আছে বাকী রুগ্ন, শয্যাগত, উত্থানশক্তি রহিত।

নরেন্দ্রনাথ রায় নামক একজন বাঙ্গালী ডাক্তার তাহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। হঠাৎ চন্দ্রনাথের উপর তাঁহার কেমন মায়া জন্মিয়া গেল।

তিনি বাড়ী যাইতেছিলেন কিন্তু চন্দ্রনাথকে ওরূপ অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। প্রাণপণে তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তাহার চেষ্টা ও যত্নে চন্দ্রনাথ ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার একটা হাত আর ভাল হইল না—কাজেই তাহাকে দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য হুকুম হইল।

চন্দ্রনাথের দেশের কথা মনে পড়িল—আহা! কত দিন হইল সে তাহার অনেক সাধের জন্মভূমি দেখে নাই! সেই বহুদিন পরিত্যক্ত—চিরপ্রিয়তর জন্মভূমির ক্রোড়ে একটা ক্ষুদ্র শিশুর মত ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য একটী প্রবল আগ্রহ তাহার মনটাকে

উদ্দাম, চঞ্চল করিয়া তুলিল। কিন্তু একটা কিন্তুই তাহার মধ্যে ভয়ানক একটা গোলমাল সৃষ্টি করিয়া তুলিল। এতবড় একটা স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসিয়াছে সে—আর কেমন করিয়া তাহার সেই বাপের কাছে—ভাইয়ের কাছে মুখ দেখাইবে? না, না তা আর হয় না—এই সুদূর ইউরোপের একটা সুনিভৃত কোনেই তাহার বাকী জীবনটাকে কাটাইয়া দিতে হইবে।

ডাক্তার বাবু আসিয়া বলিলেন, "কি হে চন্দ্রনাথ, আজ কেমন মনে হচ্ছে—ভাল ত?"

"আজ্ঞে, হাঁ বেশ ভাল আছি।"

"বাড়ী যাবে?" "বাড়ী? না বাড়ী যাবার ইচ্ছা নাই, জানেনই ত সব তবে আর কেন?"

"তাতে কি হয়েছে হে—নিজেদের বাড়ীতে না হয় নাই গেলে—আমাদের বাড়ীতে থেকো এখন—তবু দেশটাত দেখা হবে—এক বছর যাওনি।"

"আচ্ছা তবে যাব।"

একমাস পরে ডাক্তারবাবু বাড়ী পৌঁছিলেন। চন্দ্রনাথ ও তাহাদের বাড়ীর মধ্যে আট ক্রোশ মাত্র ব্যবধান—সেই জন্য বাড়ী আসিয়াই ডাক্তার বাবু চন্দ্রনাথের বাড়ীর খবর জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন।

হরিনাথ বাবু এতদিনে বেশ বড় দরের ব্যবসাদার হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে অঞ্চলে তাহার মত ব্যবসাদার আর একটীও ছিল না। তিনি কাঠের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাহাতে তাঁহার খুব লাভ হইতেছিল। এমন কি তিনি পাকা বাড়ী তুলিয়া ছিলেন। চন্দ্রনাথের কথা যে তাহার মাঝে মাঝে মনে না হইত এমন নহে। মনে হইলে রাগের পরিবর্ত্তে দুঃখই হইত।

ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে চন্দ্রনাথের একটুকুও ভাল লাগিত

না। বাড়ীর খবর জানিবার জন্য তাহার মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের আম গাছ ঘেরা বাড়ীটী, তাহার বাবা, তাহার ছোট ভাইটীর জন্য একটা প্রবল ইচ্ছাকে সে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিল না। না জানি তাহার বাবা ছোট ছেলেটীকে লইয়া কি রকম ভাবে আছে। না জানি মান্টু কত বড়টী হইয়াছে। কিন্তু তাহার পিতার শেষ কথা কয়টী মনে হইলেই তাহার মনটা যেন কেমন করিয়া উঠিত – মনে হইত যেন ওই কথা গুলাই তাহাকে বিষধর সর্পের মত ফণা উদ্যত করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে। একটা যাতনাপূর্ণ সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাহার হৃদয়ের সুনিভৃত প্রদেশ কম্পিত ও আন্দোলিত করিয়া বাহির হইয়া আসিত। চন্দ্রনাথ তাহার অতীতের পানে একটা ব্যথাপূর্ণ, শূন্য, করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত।

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তোমার বাড়ীর খবর আজ পেয়েছি চন্দ্রনাথ - তোমার বাবা যে ব্যবসায় করে বড়লোক হয়ে গেলেন" চন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?" "রকম আর কি, তুমি যাওয়ার পর তিনি কাঠের ব্যবসায় আরম্ভ করেন – তাতে খুব লাভ হয়েছে" চন্দ্রনাথ একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল, তাহা হইলে তারা সুখে আছে? ডাক্তার বাবু চন্দ্রনাথকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাব্‌ছ চন্দ্রনাথ?"

"ভাব্‌ছি যে আমাদের গ্রামেই চলে যাব সেখানে গ্রামের এক প্রান্তে একখানা ছোটো ঘর করে থাক্‌ব – তবুওত ছোট ভাইটাকে মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাব"

"এখানে কি তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে চন্দ্রনাথ?

"কষ্ট? কিছুনা – তবে একটা কথা যে জায়গার সঙ্গে শৈশবের, বাল্যের, কৈশোরের সমস্ত স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেই জায়গা থেকে দূরে থাক্‌তে আমার কষ্ট হয় ডাক্তার বাবু - তাই ভাব্‌ছি সেই

সেইখানেই চলে যাব—মাসে মাসে যে বৃত্তি পাই তাই দিয়েই আমার বেশ চলে যাবে।

"তোমার যদি ইচ্ছা হয় তাই যেয়ো—আমি আর কি বল্‌ব ?"

(৬)

"কি ভট্টাচাযি মশাই যে, তোমার চন্দ্রনাথ নাকি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে।" "হাঁ হাঁ মুখুয্যে ভায়া সেই রকমই শুন্‌ছি বটে কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি ওর জন্য আমার দুঃখই হয়—কিন্তু কি কর্ব্ব বল মুখ থেকে যা বেরিয়ে গিয়েছে তাত আর ফেরানো যায় না—বিশেষতঃ যে সমুদ্রযাত্রা ও অভক্ষ্যভক্ষণ করে পতিত হয়েছে তাকে ত আর ঘরে নিতে পারি না—কি বল ?"

"ওসব কথা ছেড়ে দেও দাদা—ওযে ফিরে এসেছে এটা তোমার জোর কপাল বল্‌তে হবে—শুন্‌ছি নাকি হাতে আর পায়ে গুলী লেগেছিল—তা আমরাও রাগের মাথায় ওরকম কত বলি—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসুক।

"তা তোমরা যা বল ভায়া—ও যে দিন চলে যায় সে দিনকার কথা আমার বেশ মনে আছে—ও সব কথায় আমি ভোল্‌বার লোক নই।"

এই সময়ে সেই স্থান দিয়া মানু ও পটলা ঊৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যাইতেছিল। হরিনাথ বাবু ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে তোরা ওরকমভাবে দৌড়ে কোথায় যাচ্চিস ? "এই যে বাবা শিগ্‌গীর এসো দাদা নাকি লড়াই জিতে ফিরে এসেছে" হরিনাথ বাবু গম্ভীরভাবে ডাকিলেন, "মানু এদিকে এসো একটা কথা আছে।"

পিতাকে ওরকম ভাবে ডাকিতে দেখিয়া মানু থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হরিনাথ বাবু দৃঢ়মুষ্টিতে পুত্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল পাজী আজ তোকে শিকল দিয়ে ঘরে আট্‌কে রাখ্‌ব" এই বলিয়া পুত্রকে একরকম টানিয়াই লইয়া চলিলেন।

মানু পিতার হঠাৎ এই রকম ব্যবহার দেখিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল – কিছুই বুঝিতে পারিল না।

* * * *

চন্দ্রনাথ আশা করিয়াছিল তাহার ফিরিয়া আসার সংবাদ শুনিলে মানু অন্ততঃ একবার তাহাকে দেখিতে আসিবে – কিন্তু সারাদিনের মধ্যে যখন একটীবারও তাহার দেখা পাইল না তখন তাহার মনটা বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল – আকাশে দুই একটী তারা ফুটিয়া উঠিল। চন্দ্রনাথ চাদরখানা গায়ে জড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ইচ্ছা – যদি জানালার ফাঁক দিয়াও মানুকে একটী বার দেখিয়া লইতে পারে। তাহাদের বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। অনেকগুলা ঘর খুঁজিয়া শেষে একটা ঘরে আসিয়া দেখিল মানু নীচের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। শেষে সে কি করিতেছে তাহা দেখিবার ইচ্ছা হইল। এক পা দুই পা করিয়া আগাইয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল মানুর সামনে একখানা তৃতীয় ভাগ খোলা রহিয়াছে। সে এক মনে বেণীর ছবিটা আঁকিতেছে। চন্দ্রনাথ মনে মনে হাসিতে লাগিল।

একবার ভাবিল ডাকি—আবার ভাবিল—না থাক। সে তাহার ভাইয়ের অপূর্ব্ব ছবি আঁকা দেখিতে লাগিল। এমন সময় হরিনাথ বাবু কি প্রয়োজনে বাহিরে আসিয়াছিলেন। একজন লোককে ওরকম ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানে কে ?" চন্দ্রনাথ সহসা পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া থতমত খাইয়া রহিল। হরিনাথ বাবু ভাবিলেন – নিশ্চয় ওটা চোর তা না হইলে ওরকম ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে কেন ? তাড়াতাড়ি গিয়া খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই ?" "আমি চন্দ্রনাথ"। চন্দ্রনাথ ? হরিনাথ বাবুর মাথায় কি যেন একটা

গোলমাল হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "এখানে কেন চন্দ্রনাথ? বাহিরে গোলমাল শুনিয়া মানু বাতিটা তুলিয়া ধরিল। বাতির আলো চন্দ্রনাথের মুখের উপর পড়াতে হরিনাথ বাবু পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া যেন কেমন হইয়া গেলেন। বহুদিনের কতকগুলা পুরাতন স্মৃতি তাঁহার মনের মধ্যে ভয়ানক একটা গোলমালের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। তাঁহার অন্তরের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে একটা পুরবী রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন "এখানে দাঁড়িয়ে কেন চন্দ্রনাথ, এস এস, ভিতরে এস, ওরে মানু"! "ওখানে কে বাবা?" "ওরে এই যে তোর দাদা এসেছে শিগ্‌গীর আয়"। "দাদা এসেছে?" বলিয়া মানু ছুটিয়া আসিল। "এই যে দাদা, এতদিন কোথায় ছিলে দাদা?"

চন্দ্রনাথ তাহার ছোট ভাইটীকে কোলে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিল।

শ্রীধর শ্যামল।

কবিতায় যুক্ত অক্ষর ও মিল।

যুক্ত অক্ষর ও মিল উভয়ই কাব্যসৌন্দর্য্যকলার অন্যতম অঙ্গ। অনেক সময় আমাদের কবিতার দু'একটী পংক্তি পড়িতে ভাল লাগে সেই সময় উহাতে পুনরায় সূক্ষ্মদৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে উহার সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য উভয়েই উহার মিল কিংবা শব্দ-বিন্যাসের উপর কিঞ্চিৎ নির্ভর করে। শব্দবিন্যাসে অর্থশূন্য কথাও সুমিষ্ট হইয়া থাকে ও একপ্রকার ভাবের সৃষ্টি করে। কবি সত্যেন্দ্র নাথের "দূরের সাথীর" মধ্যে কোন কোন স্থানে এই প্রকার ভাবের সৃষ্টির প্রয়াস ও সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক কবি-গণের মধ্যে অনেকেই শব্দবিন্যাসের নানা ভাবে উন্নতি করিবার জন্য

চেষ্টা করিয়াছেন। ভাবে উত্তমরূপে প্রকাশ করিতে হইলে শব্দবিন্যাসের সাহায্য লইতে হয় অর্থাৎ ভাবের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে শব্দ বাছিয়া লইতে হয়। তাই কাব্য সাহিত্যে ইহা একটা মনোযোগ আকর্ষণ করে।

শিক্ষকমহাশয়গণের নিকট এই সম্বন্ধে কিছু কিছু সাহায্য পাইয়াছি বলিয়াই আমি এই "শব্দবিন্যাস" সম্বন্ধে কিছু লিখিতে সাহস পাইতেছি। জানিনা ইহা সৎসাহস কি দুঃসাহস। যাহা আজি লিখিতে বসিয়াছি জানিনা তাহা ভুল কি শুদ্ধ। বৈজ্ঞানিক-গণ নানা তর্কজাল বিস্তার করিয়া শব্দতত্ত্ব আলোচনা করিবেন। আমি অসৎসাহসে তাহাদের বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ অপ্রমাণে এই সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিব।

যুক্ত অক্ষর এই "শব্দবিন্যাসেরই"—অন্যতম অংশ। প্রথমতঃ আমি এই সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। অনুপ্রাস কবিতার সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক। অনুপ্রাস কাব্যবীণায় যে কিরূপ ঝঙ্কার তুলে তাহা নিম্নের কয়েকটী পংক্তি হইতেই কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। যথা।—

বিমল মানস সরস বাসিনী—(১)

আকুল পুলকে উলসিছ ফুল কাননে
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল চরণে (২)

নবীন নবনী নিন্দিত করে দোহন করিছে দুগ্ধ। (৩)

মুক্ত বেণী বিবসনে বিকশিত বিশ্ববাসিনীর। (৪) ইত্যাদি

সংযুক্ত ও অসংযুক্ত অক্ষরে অনুপ্রাস—উভয়ই সুন্দর কিন্তু অসংযুক্ত শব্দবিন্যাসে অনুপ্রাস লঘু ও কোমল হয়—সংযুক্ত শব্দ-বিন্যাসে অনুপ্রাস গুরু ও গম্ভীর হইয়া থাকে। সুতরাং দুই জাতীয় ছন্দঃ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

নিম্নের পংক্তি কয়টী পড়িলে পার্থ্যক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। যথা।—

এস মুকুটে পরিয়া শ্বেতশতদল শীতল শিশির ঢালা
কুন্দ শুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা তুমি অনিন্দিতা (১)
কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি
প্রত্যহ রাখিব অঙ্কি কুঙ্কম চন্দনে কল্পনার লেখা (২)।

আরও সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার (১)
বীণা গঞ্জিত মঞ্জুভাষিনী কমলকুঞ্জাসনা (২) ইত্যাদি

সংযুক্ত অক্ষরের মধ্যে কোন্‌গুলি অধিকতর শ্রবণ-সুখকর তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

১। ঙ+ক, খ, গ, ঘ,=ঙ্ক, ঙ্খ ইত্যাদি
২। ঞ+চ, ছ, জ, ঝ=ঞ্চ, ঞ্ছ ইত্যাদি
৩। ণ+ট, ঠ, ড, ঢ,= ণ্ট, ণ্ঠ ইত্যাদি
৪। ন+ত, থ, দ, ধ,=ন্ত, ন্থ ইত্যাদি
৫। ম+প, ফ, ব, ভ=ম্প, ম্ফ ইত্যাদি।

এই পনেরটী (প্রত্যেকবর্গের পঞ্চম বর্ণের সহিত সেই বর্গের পূর্ব্ব চারিবর্ণের যে যে কোনটীর সহিত যোগ হইলে যে সকল সংযুক্ত বর্ণের উৎপত্তি হয় তাহারা) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতিমধুর। পড়িবামাত্র হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ দান করে। পরীক্ষার্থ নিম্নে কয়েক পংক্তি প্রদত্ত হইল।

(ঙ+ক) ১। অকলঙ্ক হাস্যমুখ পালঙ্কে ঘুমাইতে করে অঙ্কটীতে।
(ঞ+চ) ২। চঞ্চল করে অঞ্চল ঢালি রোষ ছলে যায় চলি।
(ণ+ঠ) ৩। করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন বসন খোল।
(ন+ত) ৪। তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।
(ম+প) ৫। বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে। ইত্যাদি।

Balance এ সংযুক্ত অক্ষরের প্রাধান্য বেশী। নিম্নের কয়েকটী পংক্তি হইতে এই প্রাধান্য দৃষ্ট হইতে পারে। (পংক্তি উদ্ধৃত করা

ব্যতীত আমার অন্য কোন উপায় নাই। তাহার কারণ পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) যথা—

অবিদিত দুঃখ হয় চিত শুদ্ধ যদি (১)

সতীর প্রণয় সম শুভ্রশির অভ্রে তুলি আজ
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে কুটীর হতে এগু এল তাই } ইত্যাদি

(প্রথমটী হইতে শেষেরগুলি অধিক মধুর)

ইংরাজীতে sound echoing the sense বলিয়া একটী কথা আছে। ইহাতে স্থান বিশেষে যুক্ত ও অসংযুক্ত দুইপ্রকার অক্ষরই সুন্দর। যথা :—

(একত্র দুই প্রকার অক্ষর)

ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি চলি যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও—আবার আনন্দপূর্ণ সুরে,
উল্লাস ফিরিয়া আসি কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে
রাশি রাশি শুভ্র হাস্যে অশ্রুজলে স্নেহগর্ব্ব সুখে
আর্দ্র করি দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্ম্মল ললাট।
আশীর্ব্বাদে * * * * * *

(বিভিন্নরূপে)

সীমাহীন নীল জল
করিতেছে থল থল
রাঙ্গা রেখা জ্বল জ্বল
কিরণমালে

এবং

উড়ে কুন্তল উড়ে অঞ্চল
উড়ে বনমালা বায়ু চঞ্চল
বাজে কঙ্কন বাজে কিঙ্কিনী
মত্ত বোল
দে দোল দোল!

উভয়ই মনোহর।

এই ত গেল সংযুক্ত অক্ষরের সংক্ষিপ্ত (অতীব সংক্ষিপ্ত) ইতিহাস। তারপর মিল। কবিতার মিলও একটী প্রধান অঙ্গ। মিলের ভাল মন্দ কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না। পড়িতে পড়িতে মিলের ভালমন্দ বিচার আপনিই আইসে। নিম্নে কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত হইল। ইহাতে মিলের নূতনত্ব ও চাতুর্য্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে বুঝা যাইবে। যথা ঃ—

মনেরে আজ কহ যে
সত্য মিথ্যা যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে (১)

নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে
তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে। (২)

নিজেরে যে ঢাক্‌তে নারি
নিজের ক্ষমা আড়ালে
আমার অনুতাপের ব্যথা
ক্ষমা দিয়েই বাড়ালে! (৩)

গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা—(৪)

প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি ব'সে ব'সে গাঁথিস্‌নে আর
বাঁধিস্‌নে স্মৃতি বাহিনী (৫)

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি

কি ঘুম তোর পেয়েছিল

হতভাগিনী (৬)

জগৎ মাতানো সঙ্গীত তানে

কে দিবে এদের নাচায়ে ?

জগতের প্রাণ করাইয়া পান

কে দিবে এদের বাঁচায়ে।

ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতি জাল পাশ

মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস

ঘুচায়ে ফেলিবে মিথ্যা তরাস

ভাঙ্গিবে জীর্ণ খাঁচা এ। (৭)

দেখা পেলাম ফাল্গুনে

এত দিন যে বসেছিলাম পথ চেয়ে

আর কাল গুণে। (৮)

ইত্যাদি।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন।

১৮৮।১৮

স্বপ্ন-দৃষ্টা।

নিদাঘের দীর্ঘ-দিন মান

কাটায়েছি শুধু অশ্রুজলে ভাসি ;

দুঃখ যাতনার দীপ্তি শিখা-রাশি

রহি রহি দহিয়াছে প্রাণ।

সন্ধ্যা আসি দেখা দিল ধীরে।

কামিনীর মূলে ঘন তৃণ' পরে

পড়িনু ঘুমায়ে আলস্যের ভরে,
　　সুশীতল মলয়—সমীরে !
দাঁড়াইয়া সম্মুখে আমার,
জ্যোৎস্নাময়ী এক মোহিনী প্রতিমা
ফুল্লশান্তচ্ছটা স্নিগ্ধ মাধুরিমা,
　　অঙ্গে অঙ্গে মহিমা বামার !
জিজ্ঞাসিনু—"কে তুমি ললনা ?
দেবী তুমি ! কেন সুরপুরী হ'তে
আসিয়াছ এই পাপের জগতে ?
　　ক্ষম দেবি ক'রনা ছলনা !"
উত্তরিলা বালা বীণাস্বরে,—
"শান্তি আমি পুণ্য স্বর্গ বিলাসিনী,
বিশ্বের বাসনা, দুঃখ-বিনাশিনী,
　　সদা তুমি কাঁদ যার তরে।"
"শান্তি, দেবি ! চিরারাধ্যা মম !
এস, বস দগ্ধ হৃদয়-আসনে !
আন মন্দাকিণী এ মরু-শ্মশানে"
　　কহিলাম আত্ম-হারা সম।
"নিরদয়া কেন এত দেবি !
পূজিয়াছি আমি আজীবন তোমা
কাঁদিতে কি শুধু ? অয়ি নিরুপমা !
　　বৃথাই কি ও চরণ সেবি ?"
"জানি সব হে ভক্ত আমার !
কিন্তু নহি তবু—পরিতুষ্টা তায়,"
কহিলা সে বালা, "সেকি কথা—হায় !"
　　সবিস্ময়ে সুধানু আবার।

আবার ধ্বনিল দিব্য বীণা,—
"অশান্তি ভগিনী মোর সহোদরা,
স্নেহময়ী—সে যে প্রাণ-প্রিয়তরা ;
তুমি তারে কর সদা ঘৃণা।
"আমরা যে অভিন্ন-পরাণ।
আমি শান্তি—হৃদি-সন্তাপ-বারিণী
সদা অশান্তির পদানুসারিণী,
তুমি তার কর অপমান।
"তাই প্রীতা নহি তব প্রতি,
সহিতে না পারি অনাদর তার,
ভয় করি তায়, হৃদয়ে যাহার
তার তরে না আছে ভকতি।
"অশান্তিরে যতনে বরিয়া
চির তরে যদি বুকে তুলি' নিতে
পার সমাদরে—অনুরক্ত চিতে,
ভক্তি-রসে পরাণ ভরিয়া—
"প্রেম পাশে হইব বন্দিনী,
তব প্রণয়িনী চির সহচরী,
হৃদয় প্রসূনে মত্ত-মধুকরী
তব চির জীবন-নন্দিনী।
অপরূপ দেখিবে তখন,
শান্তি ও অশান্তি মিশি দুইজন
পূর্ণ শান্তি মূর্ত্তি করেছি ধারণ—
হবে তব সার্থক সাধন।"
এত কহি জ্যোৎস্না স্বরূপিনী
মিলাইলা মৃদু জ্যোৎস্নালোক সনে,

জানিনু—দেখিনু জ্যোছনা বসনে
হাসে নিশি শশি সুহাসিনী।

বর্ষায়।

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জল সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা—বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।"

আজি ঘন গৌরবে নবযৌবনা গম্ভীরনাদিনী উন্মত্তা বর্ষা ধরণীতে সমাগতা। ধরণীতল বর্ষার জল সিঞ্চনে সিক্তা—প্লাবিতা—উর্ব্বরা। নিবিড় নীল গগন-পট আজি নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাজিতে সমাচ্ছন্ন। গগনের কোন স্থানেও এতটুকু ফাঁকা নাই। চারিদিকে ঘন অন্ধকার সমস্ত বন-প্রান্তর নদীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। জগৎ কি এক গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। গৃহের বহির্গমন অতি দুঃসাধ্য। বাহিরে কেবল ঝর ঝর শব্দে বারিধারা বর্ষিত হইতেছে। বাতাস রহিয়া রহিয়া বিরহীর নিশ্বাসের মত হুহু করিয়া বহিতেছে—যেন কি একটা গভীর দুঃখ প্রকৃতির বুকের উপর পাষাণ ভারের ন্যায় নিহিত—যেন সে দুঃখ অনন্ত—অসীম। অশ্রু বক্ষ ছাপাইয়া পড়িতেছে; তবুও সে দুঃখের বিরাম নাই—শেষ নাই। ব্যথা অসহ্য—তাহা শুধু গভীর বুক-ভরা ক্রন্দনেই শেষ হইতে চাহে না—শুধু অশ্রুর বন্যায় প্লাবিত হইয়াই ক্ষান্ত হয় না। তাই মাঝে মাঝে প্রকৃতি অব্যক্ত গভীর ভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। এক স্পন্দনে

হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠে। বিশ্বময় কেবলই ব্যথা। বৃন্তচ্যুত বকুল ফুল ঝরকে ঝরকে ভূমিতে পতিত হইতেছে; যেন বকুল বৃক্ষ কি এক গভীর শোকে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। চাতকের কাতর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কল্লোলিনীর কুলু কুলু শব্দে যেন কি এক গম্ভীর বিষাদ সঙ্গীত বাজিয়া উঠিতেছে। পত্রের মর্ম্মরে, নির্ঝরের ঝরঝরে কেবলই সেই ক্রন্দন স্বর—সেই বুক ফাটা হাহাকার। তাই কবি বলিয়াছেন,

"ব্যথিয়ে উঠে নীপের বন পুলক ভরা ফুলে।
উছলি উঠে কলরোদন নদীর কূলে কূলে॥"

সমস্ত বনস্থল প্রস্ফুটিত কামিনী, কেতকী, কদম্ব পুষ্প সমূহে বিকশিত—বিহঙ্গের কলরবে মুখরিত। প্রান্তর সমূহ সবুজ তৃণে আচ্ছাদিত। ক্ষেত্র সমূহ শ্যামল ধান্যে আবৃত। বনে বনে ঝিল্লীর রব সন্ধ্যার এই ঘুমন্ত পৃথিবীকে আরও নিঝুম আরও স্তব্ধ করিয়া তুলে। বাতাস ভিজা মাটীর গন্ধ বহিয়া আনে। বর্ষার অবিশ্রান্ত ঝুপ্ ঝুপ্ বারিপতন শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণেও কি এক গভীর ভাব জাগিয়া উঠে। সমস্ত প্রাণ কি এক অভিনব অনির্ব্বচনীয়-গম্ভীর-স্তব্ধ-মাধুরীতে পূর্ণ হয়। তাই,

"বর্ষার সমান সুরে অন্তর বাহির পূরে
সঙ্গীতের মুষল ধারায়।"

সমস্ত প্রাণে কি এক সঙ্গীতের হিল্লোল বহিয়া যায়। প্রাণ সে সঙ্গীতে মুগ্ধ—বিস্ময়ে নিশ্চল হইয়া রহে; আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তাই কবি গাহিয়াছেন,

"বাদল রাগিনী সজল নয়নে
গাহিছে পরাণ-হরণী!"

বর্ষার সে সঙ্গীতে যেন সেই মহান্ পরমেশ্বরের অব্যক্ত করুণা অনুভব করিতে পারা যায়। যখন অনর্গল ধারে ঝর ঝর শব্দে বৃষ্টি

পতিত হইতে থাকে; যখন জলপূর্ণা নদী বন্যার জলে উভয় কূল প্লাবিত করে; যখন জগৎ অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হয়; যখন ঝিল্লীর রব সে গাম্ভীর্য্যে অধিকতর স্তব্ধ গম্ভীর ভাব মিশাইয়া দেয় তখন প্রাণেও যেন এক গম্ভীর ভাব জাগিয়া উঠে। তখনই সত্য সত্য দেবতার আরাধনার উপযুক্ত সময়। তখনই সেই মহান্ জগদীশ্বরের রাগিণী সমস্ত মনে প্রাণে বাঁশীর সুরের ন্যায় বাজিয়া উঠে।

"এস হে এস সজল মন
বাদল বরিষণে।"

তাই কবি সেই বাদল বরিষণের মধ্যেই তাঁহার আরাধ্য দেবতার দর্শন লাভ করিতে চাহেন; সমস্ত মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে অনুভব করিতে চাহেন।

বর্ষায় যখন নভোমণ্ডল নিবিড় কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন থাকে এবং ঝর ঝর করিয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িতে থাকে তখন মনে হয়, যেন, কোন সুন্দরী রমণী স্বীয় সিক্ত-কবরী শুষ্ক করিবার অভিপ্রায়ে নিবিড় কৃষ্ণ-বর্ণ কুন্তল-দাম এলাইয়া দিয়াছেন। আর সেই কেশ-গুচ্ছ হইতে জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে।

বসন্ত যেমন জগতে যৌবন আনয়ন করে—বৃক্ষ লতা যেমন সেই বসন্তের প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা বশতঃই তাহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করে—তেমনি বর্ষাও তরঙ্গিণীকে যৌবন দান করে। তরঙ্গিণীও তাই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে কুলু কুলু রবে সেই বর্ষারই স্তব গান গাহিতে গাহিতে প্রবাহিত হয়। সে তাহার সেই যৌবনদায়িনী বর্ষাকেই নিজ কণ্ঠের অপূর্ব্ব রাগিণী শুনাইতে থাকে। সেই যুবতী তরঙ্গিণীর তখন কি সে ভয়ঙ্করী দৃপ্ত মূর্ত্তি! বিরাট ফেনায়িত জলরাশি আবর্ত্ত রচনা করিয়া দুকূল প্লাবিত করিয়া স্ফীতবক্ষে, উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে, উদ্দাম গতিতে তাহার স্বামীর সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। পতিব্রতা সাধ্বী নারীর ন্যায় তাহার হৃদয় এখন অসীম

তেজোদর্পে পরিপূর্ণ! উন্মত্তা প্রেমিকের ন্যায় গতি উদ্দাম অপ্রতিহত। সকল বাধা বিঘ্নকে এখন সে ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে ভীত করিয়া, অধীর উন্মত্ত তরঙ্গে দলিত করিয়া—নিশীথে সেই ব্রজমোহন বনমালীর সহিত মিলন-লাভেচ্ছায় ধাবিতা নির্ভীকা রাধিকার ন্যায়—অভিসারে ছুটিয়াছে, তাহার কণ্ঠের সেই ক্রুদ্ধ গর্জ্জন সেই উন্মত্ত প্রলাপ-ধ্বনি প্রাণে ভীতির সঞ্চার করে।

বর্ষা সুন্দরী। যখন জলরাশি পল্লী ছাপাইয়া কুলু কুলু রবে ছুটিয়া চলে, যখন আষাঢ় ঘনরোলে নামিয়া আসে যখন নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ-গগন-পটে সেই দামিনীর হাস্যচ্ছটা স্ফুরিত হয় যখন বিকচ মালতীর হাস্যে চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল হয়, শ্যামার তান পাপিয়াঁর রব ভাসিয়া আইসে তখন কি সে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি বিশ্বময় ফুটিয়া উঠে—কি সে মধুর সঙ্গীত বিশ্বে বাজিয়া উঠে। মনে হয় যেন কোন নিপুণ চিত্রকর জগতের সমস্ত মাধুরী সমস্ত সৌন্দর্য্য একত্রে মিশাইয়া এক অভিনব, অপরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মানুষের অঙ্কিত চিত্র নীরব—তাহাতে অঙ্কিত বিহঙ্গের সঙ্গীত শ্রুত হয় না—কিন্তু এ চিত্র সরব—ইহার বিহঙ্গের মধুর রাগিণী বিশ্বে ছাপাইয়া উঠে—পরাণ হর্ষে ভরপূর করে। আবার যখন "কাচা রোদখানি বনের ভিজে পাতায়" পতিত হয় তখন আর এক অভিনব সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়; তখন গগন ভালে অঙ্কিত সেই ইন্দ্রধনুর শোভা দর্শন করিতে করিতে নয়ন মুগ্ধ হয়—প্রাণ পুলকে মগ্ন হয়।

এই বর্ষা প্রাণে কত ছবি অঙ্কিত করিতেছে—কত বিস্মৃত ঘটনা নয়নের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিতেছে। মনে পড়ে সেই শৈশবের সেই কাগজের নৌকা জলে ভাসাইয়া দেওয়া—বাদল টুটিয়া গেলে সেই জলে ছুটাছুটি করিয়া খেলা। বাল্যকালের সেই মধুময় স্মৃতি মানসপটে ফুটিয়া উঠে, প্রাণ মন অসীম অকুল পুলকে মগ্ন হয়। সেই,

"বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান,
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।"

বর্ষার নীল-নীরদ-মালায় সমাবৃত গগন শিখী ও শিখিনীর হৃদয়ে অসীম আনন্দ উদ্রেক করে। তাহারা স্ব স্ব পুচ্ছ বিস্তার করিয়া পুলকে নৃত্য করিতে থাকে। সে দৃশ্য কি সুন্দর—কি প্রাণস্পর্শী। শিখীর নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে কবির হৃদয়ও তাহারই মত অভিনব উল্লাসে নৃত্য করিয়াছিল, তাই তিনি বলিয়াছেন,

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ুরের মত নাচেরে
হৃদয় নাচেরে!

শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ;
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচেরে!"

বর্ষার এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মনে কত কল্পনার সৃষ্টি করে। এই ঘন ঘনাবৃত গগনই কবি কালিদাসের কাব্য বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়াছিল তাই আজ যক্ষ ও যক্ষবধূর সেই বিরহের কথা—যক্ষপত্নীর পুষ্প দ্বারা দিন গণনার সেই বিচিত্র কাহিনী জগৎকে মুগ্ধ করিতেছে। বর্ষা দুঃখীর সমব্যথিনী। ব্যথিতের সেই বুকভরা বেদনা দর্শনে বর্ষাও বিষণ্ণা। তাই তাহার নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহিয়া পড়ে। ব্যথিতকে সান্ত্বনা দিতে হইলে—তাহার শোকের লাঘব করিতে হইলে—তাহার সহিত নিজেও ব্যথিত হইতে হইবে—তাহার ক্রন্দনে নিজেও অশ্রু-মোচন করিতে হইবে। সেই জন্যই বর্ষা অবিরল অশ্রুবর্ষণ করে। তাই কবি লিখিয়াছেন,

"অশ্রু ঘুচাতে ব্যথিতের সাথে
অশ্রু মিশাতে হয়,

তুমি তাহা জানো বন্ধু পুরাণো
দুর্দ্দিন সহৃদয়।”

বর্ষা পবিত্রা—নির্ম্মলা! বর্ষা শুদ্ধাচারিণী! বর্ষা দেবতার অশ্রু প্লাবন। যখন,

“গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।” তখন

মনে হয়, যেন, পরমেশ্বর এই পৃথিবীর দুঃখ দর্শনে বিষন্নহৃদয়েই গুমরিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তাঁহার বুক ফাটা ক্রন্দন স্বরই মেঘের গর্জ্জন বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীত হয়। বর্ষা পৃথিবীর তপ্ত, ক্লান্ত, ক্ষত বিক্ষত হৃদয় শীতল করিবার নিমিত্ত, জগতের মলিনতা ক্ষালন করিবার জন্য—তাহাকে শান্তির সুখময় ক্রোড়ে টানিয়া লইবার জন্যই সর্ব্বদা ব্যাকুলচিত্তে তাহার পূত বারিধারা বর্ষণ করিতেছে। তাই প্রার্থনা করি,

“ওগো দেবতার অশ্রু প্লাবন!
তোমার পাবনধারে
মলিনতা তাপ ঘুচাও মহীর
উর্ব্বর কর তারে;
নীল পদ্মের মথিত নীলিমা
ব্যথিত চক্ষে দাও,
ঘন চুম্বন দান কর, ওগো,
বুকে নাও! বুকে নাও।”

শ্রীব্রজেন্দ্রলাল সরকার।

ফ্রবেলের বাল্য জীবন।

(১)

যিনি প্রকৃত শিক্ষক তিনি একাধারে ভাবুক এবং কর্ম্মী, তাহার ভাব এবং কর্ম্মের ক্ষেত্র একই। প্রথমটি তাহার ভূয়োদর্শনের ফল, দ্বিতীয়টি তাহার দ্বারা চালিত এবং গঠিত। তাহার ভাব সম্পদ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে উহা তাহার জীবনে কিরূপ পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, বাহিরের দিক হইতে কিরূপ উত্তেজনালাভ করিয়াছে এবং কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবার সময় কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে!

ফ্রেডরিক ফ্রবেলের সম্বন্ধে এ বিষয়ে আমরা তাহার দুইখানি পত্র হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাই। দুইটীতেই তিনি তাহার জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সময় তিনি তাহার কর্ম্ম ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত দেখিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। প্রথমটি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে মিসিনজেনের ডিউক মহোদয়কে লিখিত, কিন্তু তাঁহার নিকট কখনও প্রেরিত হয় নাই। দ্বিতীয়টি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে দার্শনিক ক্রশেকে লিখিত, ইনি ফ্রবেলের শিক্ষাতত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছিলেন। একটি বালকের সমূহ ভবিষ্যৎ জীবনের বিকাশ তাহার বাল্য জীবনের উপর নির্ভর করে——এই তত্ত্বটি ফ্রবেল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন। সেই জন্যই এই পত্র গুলিতে তাহার বাল্যজীবনের সুবিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

(২)

জার্ম্মানীর অন্তর্গত স্বার্জবার্গরুডোল ষ্টাট্ রাজ্যের ওকর্‌বিস্‌বাচ নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

যখন তাহার বয়স ৯ মাস মাত্র তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা তাহার গির্জ্জার অন্তর্গত পল্লীর কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকায় সন্তানদিগের দেখা শুনায় অধিক সময় প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। সুতরাং শিশু ফ্রেডরিকের মাতৃবিয়োগ জনিত দুঃখ কষ্ট লাঘব করিবার জন্য তাঁহার পিতা কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। এই মাতৃবিয়োগ উল্লেখ করিয়াই তিনি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের পত্রে লিখিয়াছিলেন যে এই দারুণ আঘাত তাঁহার জীবনের সমস্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনার উপর এবং তাঁহার সত্তার সমুহ বিকাশের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।" তাঁহার ৪ বৎসর বয়সে পিতা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন কিন্তু তাঁহার অবস্থা যেমন ছিল সেইরূপই রহিয়া গেল। প্রেম-প্রবণতা ফ্রবেলের ভবিষ্যৎ জীবনের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। তিনি স্বতঃই ক্ষুদ্র শিশুহৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা বিমাতার উপর ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এই বালসুলভ ভালবাসা শীঘ্রই প্রতিহত হইল। সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিমাতা তাঁহার উপর এমন একটু অবহেলার ভাব দেখাইতেন যাহা কর্কশ ব্যবহারেরই নামান্তর।

তাঁহার যদি দুএকজন খেলার সাথী থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার ভাবনা স্রোত ভিন্নমুখে চালিত হইত। ভালবাসার অভাব এবং সমবয়স্ক সাথীর অভাব তাঁহার আত্মানুসন্ধান প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করিয়াছিল এবং নিজ জীবনে অধিকতর পূর্ণতা ও অধিকতর সামঞ্জস্য লাভের জন্য তাঁহার কিসের অভাব তাহাও তিনি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পিতার গির্জ্জাসংলগ্ন বাসগৃহের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণে এবং উদ্যানে তাহাকে আবদ্ধ থাকিতে হইত। বাল্য জীবন ক্ষেত্রের এই ক্ষুদ্র গতির কথা তিনি দুঃখের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা এতই ক্ষুদ্র ছিল যে এখান হইতে তিনি দূরের দৃশ্য কিছুই দেখিতে পাইতেন না। সত্য বটে

এখানকার স্বচ্ছ আকাশ এবং নির্ম্মল বাতাস হইতে তিনি বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেন কিন্তু যাহাদের জন্য তিনি পরে "মাতৃগীতি (Mother Song)" রচনা করিয়াছিলেন ইহাদের সৌন্দর্য্য এবং গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটিত করিবার জন্য কোন স্নেহপূর্ণ বাণী তাহার কর্ণ-কূহর পবিত্র করিত না। গৃহের এবং গৃহস্থালীর নানারূপ উন্নতি করিতে এবং উদ্যানের কার্য্যে তাহাকে পিতার কিছু কিছু সাহায্য করিতে হইত; ইহা দ্বারা তাহার শক্তি, কর্ম্মকুশলতা ও অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত হয়। ভবিষ্যৎ জীবনে উদ্যান-কর্ম্ম এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য্য বালকদিগের উন্নতির জন্য তিনি কেন এত উপকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ইহা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

যাজকের গৃহের ব্যাপক ধর্ম্মভাব এবং ধর্ম্ম-শিক্ষা সঙ্গহীন বিপন্ন বালকের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করিয়াছিল! ইহার প্রভাব তাহার মন হইতে কখনই তিরোহিত হয় নাই। কর্ম্ম-জীবনে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা, খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের অভ্রান্ততায় তাহার বিশ্বাস নাই এরূপ সন্দেহ করায় তাহাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইলেও এরূপ সন্দেহের যথেষ্ট কারণ কখনই ছিল না। কমিনিয়াসের (Cominius) ন্যায় ফ্রবেলও একজন খৃষ্টমতাবলম্বী শিক্ষানীতিজ্ঞ পণ্ডিত, ফ্রবেল সম্বন্ধে একথাটি ভুলিয়া যাওয়া সহজ হইলেও কমিনিয়াসের মত তাহাকে বুঝিতে হইলে এই সত্যটি মনে রাখা আবশ্যক এই ধর্ম্ম শিক্ষাই ফ্রবেলের বালহৃদয়ে সাধুতার প্রতি মহান অনুরাগ জাগরিত করিয়াছিল। কিন্তু বাল্যের কর্ম্ম-ভাব এবং অনুসন্ধিৎসু সর্ব্বদাই অনেক অমঙ্গলের কারণ হইত। সেই জন্য তিনি তাহার অন্তর্জীবনের সহিত বাহ্য সত্বার দ্বন্দ্ব বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেন। "মানব শিক্ষা" লিখিবার সময় নিশ্চয়ই ইহার স্মৃতি তাঁহার মনে বর্ত্তমান ছিল এবং সেই জন্য কোন বালকের উপর ক্রূরতার আরোপ করিবার পূর্ব্বে তিনি খুব সাবধান হইতে

উপদেশ দিয়াছেন কারণ বালকটির বিরক্তিকর কার্য্যগুলি অসতর্কতা ও অনভিজ্ঞতার ফল হইতে পারে।

ফ্রবেলের প্রথম পাঠ শিক্ষার ভার তাঁহার পিতার হস্তেই ছিল। এই কার্য্যে তিনি এতদূর অসুবিধা অনুভব করিয়াছিলেন যে সন্তানের অপরাপর শিক্ষার দায়িত্ব লইবার বাসনা তাঁহার মন হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল। শিশু-শিক্ষাকে সহজ এবং শিশু প্রকৃতির অনুযায়ী করিবার ইচ্ছা প্রথম শিক্ষায় এই কষ্টকর অভিজ্ঞতা হইতেই এই সময়ে তাঁহার মনে অজ্ঞাতসারে অঙ্কুরিত হয়। এই ইচ্ছাটিই তাঁহার জীবনের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় চেষ্টার উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল এবং ইহাই "লীনা কিরূপে লিখিতে এবং পড়িতে শিখিয়াছিল" নামধেয় মনোরম লক্শাটের প্রাণ স্বরূপ।

"এসো"।

এসো প্রভাতের মত আঁধার নাশিয়া
উজল অমল কিরণে;
এসো, সন্ধ্যার মত ধীরে ধীরে ওগো
ক্লান্ত তপ্ত জীবনে।
এসো, শীত অবসানে বসন্তের মত
নব আনন্দ প্লাবনে;
এসো, তৃষিত অধরে বারিধারা সম
নীরদ নবীন শ্রাবণে।
এসো, আঁধার নিশার-শশধর-সম
জ্যোছনার রাশি ছড়ায়ে;

এসো, গগনের গায়ে থরে, থরে, থরে
তারকার মালা ছড়ায়ে।
এসো, ভিখারীর কাছে ভিক্ষার মত
যাচকের আশা পুরাতে;
এসো, ব্যথিতের প্রাণে শান্তির মত
তাপিতের জ্বালা জুড়াতে।

শ্রীগণেশ চন্দ্র চৌধুরী।

সন্ধ্যা।

ক্ষান্ত হ'ও ধীরে কথা ক'ও! ওরে মন,
নত কর শির! দিবা হ'ল সমাপন
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী। * *

পরমেশ্বর আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেম জগতের প্রত্যেক সুন্দর বস্তুতে। কিন্তু আপনাকে অনুভব করিতে দিয়াছেন সব চেয়ে বেশী সন্ধ্যায়। তাই সন্ধ্যা এত শান্ত, এত উদার, এত সুন্দর। জগতে এই সন্ধ্যায়ই তিনি কিঞ্চিত পরিমাণে ধরা দিয়াছেন। তাঁহার স্নেহস্পর্শে সন্ধ্যা সংযত, সন্ধ্যা গম্ভীর, অনন্তের স্পর্শে সন্ধ্যা আপনার মধ্যে ভরপূর হইয়া উঠে। তাই সন্ধ্যায় আমাদের মন সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকিতে চাহে না। সন্ধ্যার মত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে চায়, বিশ্বের প্রতি বস্তুটাকে আঁকড়িয়া ধরিতে চায়। আপনার মত করিয়া লইতে চাহে। তখন আমরা মহান্ ঈশ্বরের স্পর্শ লাভ করিয়াছি, তাঁহার নীরব অর্থপূর্ণ আদেশ বাণী শুনিতে পাইয়াছি। তাই তখন আমরা এত উদার, এত প্রেমিক।

সন্ধ্যা নীরব কবি। তাই এত সুন্দর ভাবে মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতি ভাবটীকে ছন্দোবন্ধ করিতে চায়, প্রতি ছন্দটীকে সুরে বাঁধিতে চায়। তাই প্রতি ছন্দ প্রতি সুরটীকে আপনার প্রাণ মন দিয়া আরও মধুরতর, আরো সুন্দরতর করিতে চাহে। তাই সন্ধ্যার গান ভাবে ভরা সন্ধ্যার গান প্রাণে ভরা।

সন্ধ্যায় আমরা কবি, সন্ধ্যায় আমরা শান্ত। চির শান্তিময়ী সন্ধ্যা চিন্তাক্লিষ্ট জীবগণের মনে শান্তিদান করিবার জন্য সারা-দিবসের দীর্ঘ পরিশ্রমের পর ঘর্ম্মাক্ত মুখখানি মুছাইয়া দিবার জন্য স্বীয় শান্তিপূর্ণ অঞ্চল খানি সারা বিশ্ব ঘেরিয়া রাখিয়াছে।

তাই মুগ্ধ কবি গাহিয়াছেন, "সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী।"

* * * *

"সন্ধ্যাসতী জ্বালাইয়া দিল মন্দিরে মন্দিরে
আরতির বাতি।"

* * * *

সন্ধ্যা ভক্তিময়ী, তাই সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠে। সে ঘণ্টাধ্বনির একটা তীব্র শক্তি আছে। সে শক্তিতে আমাদের মন কাঁহার চরণোদ্দেশে আপনিই নত হয়। সে নতিতে ভক্তি আপনিই আসিয়া ধরা দেয়।

বিরাগিনী সন্ধ্যা আমাদের মনে একটা অপূর্ব্ব বৈরাগ্য ভাব আনিয়া দেয়। সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর প্রতি আকর্ষণী শক্তি আপনিই শিথিল হইয়া আইসে—সব ছাড়িয়া ফেলিয়া মন কোথায় কোন অজানা উদ্দেশে সকল পথকণ্টক দলিয়া ছুটিয়া যাইতে চাহে।

সন্ধ্যা রহস্যময়ী সন্ধ্যা ভাবময়ী। তাই সন্ধ্যাবেলায় অতীতের কত কথা, কত স্মৃতি হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আনন্দ রস ছড়াইয়া দেয়। বিশ্বের কত পরিবর্ত্তন, কত রহস্য, কত ভাব ধীরে ধীরে মনে পড়ে। তাই যখন অকারণে দিগন্তের পানে চাহিয়া এই সকল রহস্যভেদে

ব্যর্থ হইয়া পুনরায় জগতের পানে এ মুগ্ধ চক্ষু দুটি ফিরাই তখন অকারণে গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে থাকে।

সন্ধ্যার গান অধিক গাহিতে ইচ্ছা করে বলিয়াই বুঝি কণ্ঠরোধ হইয়া আইসে। চির নীরব ভগবান বোধ হয়—তাহাই চান্। তাই বিস্ময়ে ভক্তিনত হৃদয়ে গাহি—

"হে অসীম একি সীমা বন্ধনে আপনারে দিলে ধরা—
তব করুণার গৌরবে আজি অন্তর মম ভরা
বিস্ময় নত হৃদয় আমার ; গর্ব্ব নাহিক আর
হে আমার চির চিতবাঞ্ছিত তোমারে—নমস্কার।"

শ্রীজীতেন্দ্র নাথ সেন।

সরসী তীরে।

অনেকক্ষণ হইল সূর্য্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছিল, সূর্য্য অস্তাচল গমনোন্মুখ, তবুও শেষবার পৃথিবীকে একবার দেখিয়া যাইতে বার বার সাগ্রহে চেষ্টা করিতেছিল। কমলিনী যেন তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছিল না। সে তাহার প্রেমে আবদ্ধ, তাই বলিয়া সূর্য্য সৃষ্টির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না। প্রণয়িনী কত কাঁদিল, তবুও থামিল না। অবশেষে কমলিনী চক্ষু মুদিল, তরু-শির গুলি জ্বল জ্বল হইল, বাতাস শিহরিল, মেঘ হাসিল, নানা মূর্ত্তি ধরিল, তার পরে সূর্য্য অস্ত গেল!

আমি এক স্বচ্ছ 'সরসীতীরে' বৃক্ষনিম্নে বসিয়া বালকদিগের বাল-সুলভ খেলা দেখিতে লাগিলাম। কত খেলা—যে খেলা আমি একদিন খেলিয়াছি। মনের আনন্দে হরিণ শাবকদের মত চঞ্চল। মন কত পবিত্র। রক্ত অধরে স্বর্গীয় হাসির আলোক স্ফুরিত।

কেহ বাল-সুলভ গান গাহিতেছে। সে গান ভাষাহীন, অর্থহীন

অথচ সরলতা, মাধুর্য্য ও প্রেমপূর্ণ। সেই সঙ্গীত সংসারের পাপতাপ-ক্লিষ্ট এই প্রাণেও কোমলতা সরলতা প্রেমের স্রোত প্রবাহিত করিল। তাহাদের সেই অর্থহীন, ভাষাহীন প্রেমগীতি যেন সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তার অভয় চরণতলে লুটাইয়া পড়িতেছিল। তাহাদের সেই ফুল্ল অধরের নির্ম্মল হাসি তাহাদের সেই ভাষাহীন, অর্থহীন, অথচ ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত সেই খেলা—আমার সুদূর অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিল! জাগাইয়া দিল সেই ছেলেবেলার ধুলা খেলা। সে স্মৃতি আজও কালের অধীর স্রোতে বিলীন হয় নাই। অন্তিম শ্বাসের পূর্ব্ব লক্ষণের মত আজও মনের অতি অজানা প্রদেশে ঢেউ এর মত দুলিতেছে। কতবার তাহাদিগকে দেখিলাম, কিন্তু আনন্দের ছায়া মাত্রও এ দগ্ধ প্রাণে স্পর্শ করিল না। কেবল মাত্র ক্ষত হৃদয়ের ব্যথা আবার নবীভূত হইল। মানবজীবনে এই একটি দিন। মানব যাহা হারায় তাহা পায় না। মনে পড়ে সেই সুদূর পল্লীর সুকোমল তৃণাচ্ছাদিত মাঠ, মনে পড়ে সেই বাসন্তী নব-সূর্য্যের রক্তিম কিরণ-বিধৌত ক্ষুদ্র সরোবর, মনে পড়ে সেই বসন্তানিল-কম্পিত-বিকচ-কুসুম-কিশলয়-বিভূষিত বনভূমি। সে দিন গত হইয়াছে। আর আসিবে না—এ স্মরণ যাতনা মরণ যাতনা হইতেও অধিক। ছেলেরা সব পিতামাতার নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতে হরিণ শিশুদের মত চঞ্চল গমনে চলিয়া গেল। তাহারা যেন বলিয়া গেল, আর সেদিন আসিবে না। সান্ধ্য-সমীরণ, পক্ষিগণ যেন তাহাই ঘোষণা করিল। তাহাই আমার কর্ণে বার বার প্রতিধ্বনিত হইল।

সন্ধ্যা আসিল। সন্ধ্যার অন্ধকার সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিতে আসিল, কিন্তু পারিল না। পূর্ণচন্দ্র পূর্ব্ব গগনে উদিত হইয়া পৃথিবীকে অন্ধকারের করাল গ্রাস হইতে মুক্ত করিল।

তখন সমস্ত মাঠখানি পূর্ণিমার শুভ্রোজ্জ্বল আলোকমালায় বিভূষিত। চন্দ্রের কিরণ বিক্ষুব্ধ চঞ্চল মলয়ানিল-আন্দোলিত তরঙ্গরাজির

মধ্যে হাসিতেছিল, নাচিতেছিল, খেলিতেছিল। তখন তরঙ্গের কলতান ব্যতীত অন্য কোন শব্দ সেই নির্জ্জন বসন্তের মাঠে ছিল না। তখন কোকিলের বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয়ের শোকের উচ্ছ্বাস দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বক্ষে সমীরণ সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। তখন ঝিল্লীরব নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিতেছিল। তখন পাপিয়ার তান দূরাগত মুরলী ধ্বনির ন্যায় মৃদু সঞ্চারী নৈশ পবন বক্ষে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। নৈশ নবপল্লব পূর্ণিমার ফুল্ল-জ্যোৎস্নালোকে নিশার শিশির সিক্ত হইতেছিল। ফুল্লেন্দু আপন কিরণ প্রপাত সেই সরসীর বুকে তরঙ্গের উপর ঢালিয়া দিতেছিল।

যখন কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণিমা আসে তখন পূর্ণ-যৌবনা রজনী সুন্দরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশ্রী ফুটিয়া উঠে। পূর্ণিমাই যামিনীর যৌবন, প্রকৃতির যৌবন। যেন সমস্ত পৃথিবী স্বর্ণা-ঞ্চলে শরীর আবৃত করিয়া হাসিতে থাকে।

এই পূর্ণিমাই জগতের সৌন্দর্য্য দান করিয়া বেড়াইতেছে। ও কেন জগতের উপরে বসিয়া হাসে? প্রকৃতির মন চুরি করাই কি ওর উদ্দেশ্য? পূর্ণিমা রজনীকে কি সৌন্দর্য্যই দান করিয়াছে! যেন সমস্ত বিশ্বের চতুর্দ্দিকে হাসির উৎস উছলিয়া উঠিতেছে। প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক লতা, প্রত্যেক ফল সবই যেন হাস্যে মগ্ন। ফুলগুলিও হাসিতে হাসিতেই ঢলিয়া পড়িতেছে। বসন্তানিল ফুলগুলিকে নাচাইতেছিল, তাহারা যেন ভ্রমরকুলের ভয়েই অবনত হইতেছে। পূর্ণিমা কত মনোরম, কত ভাবোদ্দীপক।

তাই পূর্ণিমা যোগে যমুনা পুলিনে কুসুমিত কদম্ব তরুমূলে মুরারী মুরলী ধ্বনি করিতেন। মোহন বংশীধারী, রাধিকা-হৃদি-রঞ্জন-মুরারী মুরলীধ্বনিতে রাধিকার মনপ্রাণ হরণ করিতেন। সমস্ত বিশ্ব সেই বংশীধ্বনি আকুল হইয়া শুনিত। যমুনার জল-তরঙ্গ আনন্দে

নাচিত। নাচিয়া বেড়াইত। এই পূর্ণিমা যোগে রসিক-রাসবিহারী রাসলীলা করিতেন। চারিদিকে বৃক্ষরাজি উপাসক-বৃন্দের ন্যায় সেই রাতুল চরণ-কমলে পত্র-পুস্প-ভক্তি-উপহার ঢালিয়া দিত। প্রমত্ত ময়ুর ময়ুরী বৃক্ষ শাখায় নৃত্য করিত। কদম্ববৃক্ষের শোভা বর্দ্ধন করিয়া নৃত্য করিত। প্রকৃতির অঙ্কে কত ক্রীড়া হইত। সে ক্রীড়ায় প্রকৃতি ভরিয়া উঠিত। এখন আর কি সে মুরারী নাই; মুরলীও নাই? সে লীলা কি শেষ হইয়াছে? কে জানে?

পূর্ণিমা, তুমি কত ভাগ্যবতী! যখন তুমি আইস, তখন মানবের ভাগ্য আইসে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে গৃহে গৃহে লক্ষ্মীর আগমন হয়। পূর্ণিমা, তুমি প্রেমিকের প্রেমোন্মত্ত হৃদয় পরিস্ফুট করিয়া দিয়া থাক। এই পূর্ণিমা কবির মন প্রাণ কোন সুদূর প্রদেশে টানিয়া লইয়া যায়। এই পূর্ণিমাই, কবির কবিত্বপূর্ণ হৃদয়খানি, দিনমণি দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী-কমলিনীর ঊষাকালীন অবগুণ্ঠন উন্মোচনের ন্যায় বিকসিত করিয়া দেয়। পূর্ণিমা কবির হৃদয়কে কত রত্ন দিয়া উন্নত করে! সকলেই পূর্ণিমা দেখে, সকলেই আনন্দে বিভোর থাকে! সকলেই কি তার সৌন্দর্য্য-ধনের অধিকারী হইতে পারে? সকলকেই কি পূর্ণিমা, তার রত্নরাজি বিতরণ করিয়া দেয়? সকলেই কি আমার মত বঞ্চিত? কত ভাবুক, কত কবি, কত প্রেমিক তোমাকে নায়িকা করিয়া কাব্য ভাণ্ডারের অধীশ্বর হইয়াছেন। তুমি তাহাদিগকে অকাতরে ভাব, কবিত্ব দান করিয়াছ; আর কি কেহ পাইতে পারে না? তোমার একি বিধান? সকলেই এক উপাদানে গঠিত, তবে কেহ দরিদ্র, কেহ ধনী কেন? কেহ তোমার দয়া পায়, কেহ পায় না কেন? কোন উদ্যানে একটি গোলাপ ফুটিলে সেকি সকলকেই স্বীয় স্নিগ্ধ গন্ধ বিতরণ করিয়া মোহিত করে না? সুনীল আকাশে একটি উজ্জ্বল তারকা ফুটিয়া উঠিলে, সেকি সকলকেই নয়নানন্দ দান করে না? (ক্রমশঃ)

অঞ্জলি

"আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা ॥"

১ম বর্ষ, } শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩২৫ { ১০ম সংখ্যা।

"জেঙ্কিন্সের" ছাত্র-গীতি।

(১)

এই আমাদের স্কুল,
ঐ ই আমাদের স্কুল,
সর্ব্ব-জয়ী কালের মাঝারে
এইত অতুল,
থাকিবে অতুল,
ঐই আমাদের স্কুল।
রক্ত-রঙ্গিন কান্তি ধরিয়া,
শ্যামল দেশ উজল করিয়া,
জগতে এ যে অতুল,
জগতে এ যে অতুল,
এই আমাদের স্কুল।
কতনা প্রাণের নবীন আবেগ,
কতনা প্রাণের ভাষা,

বক্ষ মাঝারে রহেছে ইহার
কতনা সঞ্চিত আশা ;
তাই গাই জেঙ্কিন্স-গান,
তাই গাই জেঙ্কিন্স-গান,

আর কোচবিহারের জয়,
মোদের রাজাধিরাজের জয়,
মোদের মহারাজের জয়,
মোদের মহারাজের জয় ॥

(২)

স্বাধীন বঙ্গের স্মৃতি-বিজড়িত
বাঙ্গালী রাজার দেশ,
এখানে বিশ্বের ভাব-ঊর্ম্মিরাশি
প্রাণে করে পরবেশ,
নাহি মানি কাল দেশ।
নব জীবনের নবীন ঊষায়
দেখিছি তোমায় রাণী,
সরস প্রাণে, মধুর স্পর্শে
শুনেছি কল্যাণ বাণী,
অগো, আমাদের রাণী।
শ্যামল তব শিয়রেতে ওই
ভারতের ঋষি-কুল
হিমানী-কানন চয়ন করিয়া
দিয়াছে পূজার ফুল,
তোমায় মোদের স্কুল।
জগতে তুমি অতুল,

জগতে তুমি অতুল,
ওগো, আমাদের স্কুল ।
তাই গাই তোমারি গান,
তাই গাই তোমারি গান,

আর　কোচবিহারের জয়,
জয়　রাজাধিরাজের জয়,
জয়　মহারাজের জয়,
মোদের মহারাজের জয় ॥

(৩)

অদূরে শৈল　　সহস্র-শীর্ষ
নভোদেশ আছে ছাইয়া,
এই　মহাচন্দ্রাতপ　ক্রোড়দেশে মাগো,
রহেছ হৃদয় ব্যাপিয়া,
মোদের হৃদয় ব্যাপিয়া ।
উন্মাদনাময়　　হিমশ্রেণী ওই,
তুমি ভাবময়ী জননী,
সন্তানেরে সব　　স্নেহাঞ্চল দিয়া
রেখেছ দিবস রজনী,
পালিছ দিবস রজনী ।
ওগো,　বিদ্যাতীর্থ,　চির-পরিচিতা,
তোমার মধুর মূরতি,
ভাবি কোলাহল,　সুখ দুখ মাঝে
জীবন করিবে আরতি,
আমরা করিব আরতি ।
তখনও গাইব গান,

তোমার সন্তান-গান,
মোদের জেঙ্কিন্স-গান,
মোদের জেঙ্কিন্স গান,

আর কোচবিহারের জয়,
মোদের রাজাধিরাজের জয়,
মোদের মহারাজের জয়,
মোদের মহারাজের জয় ॥

ওগো, জেঙ্কিন্স স্কুল,
ওগো, জেঙ্কিন্স স্কুল,
এই আমাদের স্কুল,
তুমি আমাদের স্কুল।
সর্ব্ব-জয়ী কালের মাঝারে
তুমি ত অতুল,
থাকিবে অতুল,
ওগো, আমাদের স্কুল।
রক্ত-রঙ্গিন কান্তি ধরিয়া,
শ্যামল দেশ উজল করিয়া,
মা, জগতে তুমি অতুল,
মা, জগতে তুমি অতুল,
ওগো, আমাদের স্কুল ॥

সৌন্দর্য্য।

নিখিল জগৎ সৌন্দর্য্যের উপাসক। সৌন্দর্য্যারাধনা ও সৌন্দর্য্য-সেবা প্রকৃতই চিরন্তন ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। ইহাতে দীক্ষা নাই, শিক্ষা নাই, ইনকুইজিশন বা পাতিত্য নাই; ইহাতে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, লিঙ্গভেদ বা বয়োবৈষম্য নাই। মিনকপিস, টাহিটান; সুসভ্য আর্য্য, বালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই সৌন্দর্য্যসেবায় তুল্য অধিকারী. এবং সকলেই স্ব স্ব সামর্থ্য ও আশায় অনুসারে সেই অধিকারের পূর্ণ ব্যবহারে প্রয়াস পাইতেছে। আবার, বরুণ, মিত্র পূষন্, পার্জন্য, থর, জেহোভা কত কত দেবতা কালের পরিণতিতে সিংহাসন-শূন্য ও নিষ্প্রভ হইয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব মাত্রে পরিণত হইয়াছেন, কিন্তু সৌন্দর্য্যদেবের প্রভাব ও সমুজ্জ্বল কমনীয় মূর্ত্তি কদাচিৎ অপচীয়মান বা ক্ষীণপ্রভ লক্ষিত হয় নাই। বস্তুতঃ সৌন্দর্য্য-সেবাই মানবজাতির ইতিহাস। অথবা, ইহা অনাদি, অনন্ত—ব্যক্ত মধ্য মাত্র। কিন্তু যাহার এই শাশ্বত অপ্রতিহত প্রভাব—যাহার আরাধনাচেষ্টাই মানবজাতির জীবনসংগ্রামের মূল হেতু, সেই সৌন্দর্য্য কি, কোথায়? জগৎ এই প্রশ্ন শুনিতে চায় না, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার উত্তরের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কল্পনা-লোকবিহারী যুবক হয় ত বলিবেন শরতের পূর্ণশশী, সরসীর মলয়-চঞ্চল ফুল্ল কমল. বসন্তে চূতকিশলয়-কষায়কণ্ঠ কোকিলের কুহুতান, আর এই সকলের সমষ্টিভূত স্থিরাকল্পনার পার্থিব পরিণতিই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। বর্ষীয়সী প্রসূতি হয় ত স্নেহ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিবেন পতিদেবতার পদকমল আর নন্দদুলালের প্রফুল্ল বদন-চন্দ্রমাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। আবার সংসারাশ্রম ছাড়িয়া তপোবনে

যদি উপস্থিত হই, তবে সেখানে হয় ত দেখিব সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি ও ধ্যান সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, সর্ব্বত্রই এক সৌন্দর্য্যেরই উপাসনা দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু তাহার সর্ব্ব-জন বিদিত ও অবিসংবাদিত কোন ধ্যানই প্রচলিত নাই। কিন্তু আরাধ্য বস্তুর স্বরূপাবগতি ব্যতীত ভাবুক সাধকের পরিতৃপ্তি হইতে পারে না। সৌন্দর্য্য-কলাভিমানী বলিতে পারেন, সাম্য, সামঞ্জস্য ও সৌষ্ঠবই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য বস্তুগত, কিন্তু বিভেদ্য নহে, উপভোগ্য মাত্র। কিন্তু একই বস্তু ত যুগপৎ সুন্দর ও কুৎসিৎ রূপে প্রতিভাত হইতে পারে। যে অমিয়াংশু স্নিগ্ধ হাসিতে যুবক হৃদয়ে সৌন্দর্য্য-রাজ-রূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই ত প্রোষিত ভর্ত্তৃকা পরম তাপকর বলিয়া পরিত্যাগ করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে। "অসিত বরণ সুত-আনন" জননীর স্নেহদৃষ্টিতে সৌন্দর্য্যের প্রকৃষ্টতম আদর্শ, সমগ্র জগৎ কিন্তু তাহার প্রতিকূল সমালোচক। নির্গন্ধ 'ডেজি" সর্ব্বজন-উপেক্ষিত কিন্তু কবির হৃদয়ে, শান্ত, বিনয়ী, প্রফুল্ল, সুখী, সুন্দর ও মধুর। তবে আর সৌন্দর্য্য বস্তুগত বা বস্তুনিষ্ঠ বলি কি ভাবে? মনোবিজ্ঞানবিদ্ হয় ত বলিবেন, সৌন্দর্য্য বস্তুনিষ্ঠ বটে কিন্তু অনুভূতি সাপেক্ষ। সুতরাং হৃদয়হীন ব্যক্তি যাহাকে কুরূপ বলিয়া অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করেন, ভাবপ্রবণ হৃদয়ে হয় ত তাহা পরম সুন্দর রূপে প্রতিভাত হইবে। পেচকের নৈশ সঙ্গীত প্রাকৃত-জনের কর্ণন্তুদ ও মনোবেদনাকর, কিন্তু নীতি-জিজ্ঞাসু কবির পক্ষে তাহাই পরম হৃদয় অতএব কর্ণসুখকর। স্বীকার করিতে পারি যে, সৌন্দর্য্য অনুভূতি সাপেক্ষ, কিন্তু অনুভূতিই ত সৌন্দর্য্য নহে। অধিকন্তু অনুভূতি বৈষম্য অবশ্য স্বীকার্য্য, সুতরাং তাহার কারণও অবশ্যই নির্ণেয় বা অনুসন্ধেয়। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাকে বর্ত্তমান অনুকূল বেদনীয়তার কারণ নির্দ্দেশ করিলে অনবস্থাদোষ ঘটে কিন্তু তাহাতে প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় না। সুতরাং অনুভূতিবাদী সর্ব্বতো-

ভাবেই—আত্মপক্ষ সমর্থনে অসমর্থ। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া হয় ত—বিজ্ঞানবাদীর আনুকূল্য প্রার্থী হইবেন। কিন্তু সৌন্দর্য্য-নির্ণয়-সংগ্রামে বিজ্ঞানবাদীর সাহায্যেই জয়লাভ সুদূর—পরাহত। অনুভূতিবাদী যখনই বিজ্ঞানবাদীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবে, তখনই তাহার পরাভব সুনিশ্চিত। যদি কোন বস্তুকে সুন্দর বলিয়া জানি, তাহা হইলে সৌন্দর্য্য ত জ্ঞেয়, পরে তাহা উপভোগ্য হইতে পারে, কিন্তু পশ্চাৎ অনুভূতি ত জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য্য নহে। অধিকন্তু, আবার সেই প্রাচীন প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে—সৌন্দর্য্য কি ? সৌন্দর্য্য অজ্ঞেয় অনির্দ্দেশ্য কল্পনা মাত্র—ইহাও বলিতে পারি না, কারণ কল্পনাও প্রত্যক্ষমূলক। বিশেষতঃ সৌন্দর্য্য যে জ্ঞেয় তাহাত স্বীকার করা গিয়াছে। সুতরাং সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব, প্রকৃত অস্তিত্ব অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সৌন্দর্য্য কি পদার্থ, না পদার্থ-নিষ্ঠ ? পদার্থ-নিষ্ঠ হইলে উহা কি পদার্থের গুণ, ধর্ম্ম না স্বরূপ ? প্রথমতঃ, সৌন্দর্য্য পদার্থ হইতে পারে না। কারণ বস্তু-ব্যতিরিক্ত সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ সৌন্দর্য্য পদার্থের কোন বা ধর্ম্ম, একথাও বলিতে পারি, না, যেহেতু গুণ গুণী ধর্ম্ম ধর্ম্মীর অবিনাভাবিত্ব প্রসিদ্ধ ও যুক্তি-সঙ্গত। কিন্তু অবিনাভাবী সৌন্দর্য্য ত কুত্রাপি প্রত্যক্ষ গোচর হয় না। দারুব্রহ্মের পাণিপাদ রহিত রঞ্জিত মূর্ত্তি বৈষ্ণব ভক্তের নিকট সুন্দরতম, কিন্তু তাদৃশ দারু খণ্ডের সহিত সৌন্দর্য্যের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে তাহা হয়ত সর্ব্বাদিসম্মত নহে। সেইরূপ, ক্রুশ খ্রীষ্টান জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুন্দরতম, কিন্তু তাহারও নিরপেক্ষ সমালোচকের অভাব নাই। অতএব সৌন্দর্য্য বস্তুধর্ম্ম এ কথা প্রমাণসহ নহে।

তবে কি সৌন্দর্য্য বস্তু স্বরূপ ? কাহার স্বরূপ ? বস্তু স্বরূপ ত বস্তুমাত্র। কিন্তু সৌন্দর্য্যের বস্তুত্ব ও পৃথগ্ অস্তিত্ব ত পূর্ব্বেই

নিরাকৃত হইয়াছে। তবে সৌন্দর্য্য কি? এইরূপে, যদি আমরা সৌন্দর্য্যতত্ত্ব গবেষণা করি, আমরা দেখিতে পাই সৌন্দর্য্য আমাদের নিত্য পরিচিত হইলেও আমরা ইহার প্রকৃত পরিচয় জানি না। আমাদের জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতায় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে ইহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। সৌন্দর্য্য এক মহা সত্য। ইহা গুণও নহে, ধর্ম্মও নহে এবং কদাপি বস্তু বিশেষ পরিনিষ্ঠিত নহে। জগতের প্রতিবস্তুই সুন্দর। সৌন্দর্য্য কেবল সার্ব্বভৌম। "সত্যং শিবং সুন্দরং।" সেই মহনীয় অনন্ত সুন্দরের অস্ফুট প্রতিবিম্বই লৌকিক জগতের বাস্তবিক সৌন্দর্য্য। কৌৎসিত্য সৌন্দর্য্য-প্রতিষেধী নহে, সৌন্দর্য্য-প্রকাশক মাত্র। দ্বৈধ নাই ইহাই সত্য—সত্যং শিবং সুন্দরং।

চিত্রকর।

ওগো চিত্রকর! আঁকিতেছ দিন যামি'
যেই চিত্র অন্তরের পটে, ভাবি আমি
কবে হবে শেষ! বসি স্মৃতির দুয়ারে
দেখি চাহে চিত্রপানে হৃদয় মাঝারে
জাগে কোন ব্যথাভরা সঙ্গীতের তান;
চাহেনা আসিতে ফিরে মুগ্ধ দু'নয়ান
এক চিত্র দেখি সঙ্গী জন দুই তিন
খেলিতেছে খেলা গৃহ রচি, সারাদিন
বকুলের তলে; কভু দু'একটী ক'রে'
ঝরে পড়ে ফুল মন্দ সমীরণ-ভরে;
দূর আম্রবণ হ'তে আসিছে জাগিয়া
কুহুরব; শাখে বসি গাহিছে পাপিয়া;

খেলা করে তারা দু একটি আম টুটে
পড়ে শাখা হ'তে দক্ষিণ বাতাসে ছুটে
যায় আনিতে কুড়ায়ে তারা। তারপর
দেখি চেয়ে অন্যভীতে আরো মনোহর
ছবি ; মুগ্ধ হয়ে যাই ! দেখি সন্ধ্যাসতী
জ্বালিছে তিমির তীরে তারকার বাতি,
তারা করে ছুটাছুটি স্তব্ধ গ্রামপথে
ধরিতে জোনাকী ; কভু বসি একসাথে
করে আলাপন শুধু অর্থহীন ভাষা—
কত অশ্রু কত হাসি, কত ভালবাসা—
মেশামিশি কত ; তারপর দেখি তারা
কোথা ? কোথা আর সে জীবন ? কেহ হারা
হয়ে গেছে সংসার সাগরে ; বৃন্ত হতে
কেহ পড়িয়াছে ঝরি, কেহ সুখস্রোতে
ভাসে, ফোটে হাসি-রাশি নিয়ত চৌদিকে ;
আশাতরু ফলে ভরা ফলিয়াছে ফল কেহ স্ফীত বুকে
ছুটিছে কিসের লাগি নাহি জানে ; ফুটে
পায়ে কত কাঁটা ক্ষণে ক্ষণে ; নাহি টুটে
নেশা তবু। ওগো॥ চাহিনা দেখিতে আর
চিত্র তব—দুঃখ তীব্র বেদনার
মূর্ত্তিমতী ছবি। থামাও অঙ্কন এবে
আঁক পুনঃ একমনে সযতনে তবে
সেই ছবি সেই শৈশবের ধূলা খেলা
সেই হাস্য, সেই অশ্রু, সেই স্নেহ লীলা !

শ্রীশ্রীধর শ্যামল।

চরিত্র।

মানব জীবমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠপদারূঢ়। মানবের সেই শ্রেষ্ঠত্ব বা মানবত্ব কোথায়? আকারগত না গুণানুরোধী? আকারগত বৈশিষ্ট্য মানবের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইতে পারে না, যেহেতু জীবন-সংগ্রামে তাদৃশ আকার ও দেহগঠন সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী কি না তদ্বিষয়ে বিষম সংশয় আছে। অথবা মানবের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু শব্দগত একথাও বলা চলে না; কারণ তাহা হইলে মানবের বাস্তবিক শ্রেষ্ঠত্বই অস্বীকার করা হয়। আর মানবের সুবিন্যস্ত অর্থযুক্ত শব্দ বা ভাষা আছে বলিয়াই তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না, যেহেতু অর্থক্রিয়াই ভাষার প্রয়োজন এবং সকল ভাষাই তদ্বিষয়ে তুল্য। এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক এই উভয়বিধ উপপত্তি দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, বিবেক, বুদ্ধি প্রভৃতি অনন্যসাধারণ গুণরাশিই মানবের বিশেষত্ব—তাহাতেই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু শুধু জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বের জন্য আমরা মানুষের প্রশংসা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে যিনি বিধিদত্ত বুদ্ধিবিবেকাদির সদ্ব্যবহার করতঃ নিজ জীবনের ও মনের উৎকর্ষ সাধন করিতে প্রয়াস পান এবং সমগ্র মানবজাতিকে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করতঃ পুরুষার্থ লাভের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাঁহাকেই আমরা হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তি অর্ঘ্য দ্বারা অর্চ্চনা করি। এই বিবেক-নির্দ্দেশিত জীবন যাপন প্রণালী, তদনুরূপ দেহ, মনের নিয়োগ ও সংযম ইত্যাদি ইহাকেই চরিত্র বলা যায়।

চরিত্র সমস্ত সদ্‌গুণের সমাশ্রয় বা বিকাশসূচক। চরিত্রই মানবের মানসিক সৎপ্রবৃত্তিনিচয়ের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের হেতু। চরিত্রবান্ ব্যক্তির হৃদয়ে একাধারে সত্যপরায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সৎসাহস, কর্ত্তব্য কর্ম্মে উৎসাহ, সংযমশক্তি প্রভৃতি বৃত্তি নিচয়ের

স্ফূর্ত্তি লাভ হয় এবং শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা মেধা প্রভৃতি শক্তি সমূহের সম্যক্ বিকাশ হয়।

চরিত্রবান্ ব্যক্তি চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া, ক্রোধ, দ্বেষ, অহঙ্কার প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে সমর্থ হয়। চরিত্রের উৎকর্ষসাধনই মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মজগতে মানবের অস্তিত্ব কোথায়? মানব ধর্ম্ম-জগতের দ্বারদেশে উপনীত হইতে ইচ্ছা করিলে তাহার চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনই প্রধান উপায়। চরিত্র অমূল্য সম্পত্তি, ইহা পার্থিব সম্পত্তির ন্যায় পার্থিব মূল্যের দ্বারা ক্রয় করা যায় না, ইহা মানব-জীবনের শিরোভূষণ-স্বরূপ মহত্ত্ব ও গৌরবের পরিচায়ক। চরিত্রবান্ ব্যক্তিই আদর্শ পুরুষ তাঁহারাই জগতে আদর্শ পুরুষ, তাঁহারাই জগতকে স্বর্গে পরিণত করেন এবং তাঁহাদেরই অভাবে জগত নারকীয় দৃশ্যে পরিণত হয়। ধর্ম্ম, সৎসাহস, বল, বীর্য্য, সম্পদ ইত্যাদি চরিত্রবান্ ব্যক্তিকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

চরিত্রবান্ ব্যক্তির সাধুতায়, কর্ত্তব্যপরায়ণাতায় জগৎ নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। কারণ তাহা না হইলে জগতে সামঞ্জস্য লক্ষিত হইত না। সৎ অসৎ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, সুখ দুঃখ, শীতোষ্ণ প্রভৃতির কোন দ্বন্দ্ব দেখিতে পাইতাম না। জগৎ নিশ্চল, আঁধার ও অসার বলিয়া বোধ হইত, সয়তানের লীলাভূমি হইত। এই দ্বন্দ্বে জয়লাভ না করিয়া সাধারণ মানব উচ্চাবস্থায় পঁহুছিতে পারে না। চরিত্রবান্ ব্যক্তি এই দ্বন্দ্বে নদীবক্ষে শুষ্কবৃক্ষ পত্রের ন্যায় গা ঢালিয়া দিয়া থাকে না। তাঁহারা ঐ দ্বন্দ্বে সমতা রক্ষা ও জয়লাভ করিয়া ধর্ম্ম-পথের পথিক হইতে পারে। তাঁহারা অমূল্যরত্নের অধিকারী, মর্ত্তবাসী হইয়াও অমর, অকিঞ্চন হইলেও রাজরাজেশ্বর, শাস্ত্রজ্ঞানহীন হইলেও পরমজ্ঞানী। চরিত্রবান্ ব্যক্তি এই নশ্বর সংসারে ক্ষণকাল জীবন ধারণ করেন বলিয়াই সুখ বা সুখের ছায়া জীবমাত্রেরই

অনুভূত হইয়া থাকে। তাঁহারা সংসারে যে সদ্ বীজ বপন করিয়া যান তাহাই অঙ্কুরিত ইহয়া শাখা প্রশাখা, ফলপুষ্পে সুশোভিত হয় এবং জনসাধারণ তাহার ছায়ায় হৃদয়-মন্দিরে প্রকৃত সুখের আস্বাদন অনুভব করিতে থাকে। এইরূপ ধরায় যত চরিত্রবান্ মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইবে ততই মঙ্গল ও সুফল এবং পৃথিবী স্বর্গতুল্য হইবে।

অতএব ব্যক্তিমাত্রেরই সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক। জীবন ধারণ করিতে হইলেই চরিত্ররত্নে বিভূষিত হইতে হইবে, নচেৎ জীবন ধারণ এ সংসারে ভারাক্রান্ত ও আবর্জ্জনাময়। এখন দেখিতেছি যে চরিত্র জীবনের সর্ব্বপ্রধান সহায় ও আশ্রয়। কি উপায়ে তাহার গঠন ও সংরক্ষণ হইতে পারে তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই সংসারে ধারাবাহিক জীবন যাপনের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয় ও অবলম্বনীয় তাহা মনে মনে অনুধাবন পূর্ব্বক স্থিরীকৃত করিতে হইবে। জীবনের প্রথম হইতেই কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া তাহা সযত্নে পালন করিতে হইবে। এতৎপথাবলম্বী না হইলে জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হইবে। মনের সংকল্পানুযায়ী সাধনাশক্তি লাভ করিতে হইবে। যদি মনে মনে সংকল্প করিয়া তৎসাধনে শক্তি প্রয়োগ করিতে না পারি তাহা হইলে সর্ব্বৈব মিথ্যা। আন্তরিক সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, অবিরাম তীব্র আত্মদৃষ্টি, সময়োচিত আত্মসংযম ও কঠোর আত্ম-শাসনে স্বীয় চিন্তা, ভাব ও কার্য্যকে সাধু পথে পরিণত করিতে পারিলে অনুপম চরিত্র লাভে সমর্থ হওয়া যায়। তাহা হইলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুনিচয়ের প্রাধান্য ও অধিপত্য স্বীকার না করিয়া সাধু পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারা যায়—তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সাধুসঙ্গ ও সদ্দৃষ্টান্ত আমাদের চরিত্র সংগঠনের প্রধান সহায়।

সজ্জনসহবাসের উপকারিতা অপরিসীম। সৎসঙ্গের প্রভাবে অসদ্-গুণাবলম্বীর বিনাশ ও সৎপ্রবৃত্তিনিচয়ের সম্যক স্ফূর্ত্তিলাভ হয়। সাধুদৃষ্টান্তে তদনুরূপ জীবন লাভে চরিত্রবান্ ব্যক্তিদিগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং সেই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা সাধু-জীবনী অধ্যয়ন, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সদনুষ্ঠানাভ্যাস করিয়া থাকে। ইহাতে চরিত্রের পবিত্রতা সংরক্ষিত হয়। তাই বলিয়া ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না যে নানাবিধ বিদ্যাশিক্ষা করিলেই চরিত্রের উৎকর্ষ ও পবিত্রতা সঙ্গে সঙ্গে লাভ হইবে। বিদ্যাশিক্ষার সহিত চরিত্রের পবিত্রতা ও উৎকর্ষের তাদৃশ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বিদ্যার সহিত সচ্চরিত্রের সংযোগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। একজন চরিত্রহীন নানা বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি মণিভূষিত কালভুজঙ্গের ন্যায় ভয়াবহ। বিদ্যার সহিত অপকৃষ্ট চরিত্রের সম্মিলন অত্যন্ত অনিষ্টকর।

পাপকে আপনা হইতেই মনে উদয় হইতে না দেওয়া এবং তাহাকে কিছুতেই নিকটে আসিতে না দেওয়াই বিধেয়। যে ব্যক্তি যে বিষয়ে রসজ্ঞ নহে তাহাতে তাহার কামনা জন্মে না, স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ক্রিয়া হইতেই এই কামনা জন্মিয়া থাকে। অতএব যাহা হইতে কোন দূষিত বাসনা মনে উপস্থিত হইবার সম্ভব তাহা স্পর্শ, দর্শন, মনন, শ্রবণ কিংবা অশন করিবে না। সমস্ত প্রলোভন হইতে দূরে থাকায় এবং তাহার প্রভাব যাহাতে মনোমধ্যে বিস্তৃত হইতে না পারে তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

যিনি যে পাপে আক্রান্ত হইয়াছেন তাহার সেই বিষয়ের আলোচনা ও চিন্তা করা কর্ত্তব্য। কামে কি কুফল, ক্রোধে কি কুফল, কামক্রোধ হইতে উদ্ভূত দোষগুলির কোনটা কি কুফল—এই ভাবে দোষ মাত্রেরই কুফল চিন্তা করিতে হইবে ও তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। কারণ প্রত্যেক পাপের জন্য ইহলোক হউক পর-

লোক হউক অথবা আজ হউক, কি দুই দিনে পরে হউক—বিধি-নির্দ্দিষ্ট শাস্তিভোগ করিতে হইবে। এই সত্যটীর আলোচনা স্থির ভাবে চিন্তা করিলে সেই দোষের দিকে মন কখনই অগ্রসর হইতে পারে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পাপের ফল ইহলোকেই ভোগ করিতে হইবে। অত্যুৎকট পাপের ফল তিন দিনেই হউক, তিন মাসেই হউক কি তিন বৎসরেই হউক ইহলোকেই ভোগ করিতে হইবে। ইহা মনে হইলে মন সহজেই পাপ পথ হইতে বিরত হইতে থাকিবে।

পাপ যে কি দোষ এবং তাহার কি ফল, তাহার ফলভোগ ইত্যাদি বর্ণিত হইল, এখন পাপীর দুঃখ এবং পুণ্যাত্মার সুখ পর্য্যালোচনা করা যাউক। পাপী আপাত মধুর পাপ করিতে যাইয়া কিরূপ ক্লিষ্ট হয় এবং পুণ্যাত্মার কিরূপ অপার আনন্দ সম্ভোগ হয় ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। পাপপ্রবৃত্তি কি সর্ব্বনাশ ঘটায় এবং সৎপ্রবৃত্তি কি অমৃতময় শুভ ফল উৎপাদন করে তাহার প্রত্যেকের নিজের জীবনের অতীত অংশ আলোচনা করিলেই বিশেষরূপে বোধগম্য হইবে। কিঞ্চিন্মাত্র অন্তর্দৃষ্টি করিলেই পাপের অন্তর্দাহ ও পবিত্রতার উৎসবানন্দ হৃদয়ের অভ্যন্তরে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। যিনি চরিত্রের পবিত্রতায় জীবন পুণ্যময় করিয়াছেন তিনি অত্যুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় শিরোদেশ উন্নত করিয়া গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন। আর সাম্রাজ্যের অধিপতি পাপের স্রোতে গা ঢালিয়া থাকেন বলিয়া সকলেরই ঘৃণার তাচ্ছিল্যের পাত্র। যে কোন ব্যক্তির অথবা যে কোন জাতির অতীত কি বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিলেই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যাইবে। দরিদ্র পাপাচারী ব্যক্তিগণ দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে, ভয় হইতে ভয় ও মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে পতিত হয়। আর ধনী, জিতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান্ পুণ্যাচারী ব্যক্তিগণ উৎসব হইতে উৎসবে,

সুখ হইতে সুখে ও স্বর্গ হইতে স্বর্গে গমন করেন। ভীষ্মদেব পাপাচারীদিগকে দরিদ্র ও পুণ্যাচারীদিগকে ধনী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিকই পাপাচারীর ন্যায় কৃপার পাত্র আর কোথায়? তাহার মনের ভিতরে যাতনা—বাহিরে গঞ্জনা—তাহার ইহলোকও নষ্ট পরলোকও নষ্ট। এইস্থানে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে পাপীদের কি মুক্তির কোন উপায় নাই? আছে—তাহা এই ঃ—পাপজয়ী মহাপুরুষগণের জীবনচরিত্র পাঠ ও শ্রবণ এবং কি উপায়ে তাঁহারা পাপজয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহার অনুধাবন ও পাপবিরোধিগণের সঙ্গলাভ প্রভৃতি চরিত্র গঠনের প্রধান সহায় ও তাহাদের মুক্তির উপায়। যাঁহাদিগের জীবন অগ্নিময় তাঁহাদিগের সংস্পর্শে আসিলে যাহার প্রাণে যতটুকু তেজ থাকে তাহা তৎক্ষণাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

আমাদের সকলকেই পাপরূপ সয়তানকে দূর করিতে হইবে। পাপের দৃঢ় নিগড় আমরা অনায়াসেই ছিন্ন করিতে পারি যদি রাম, লক্ষ্মণ, হরিশ্চন্দ্র, শাক্যসিংহ শঙ্করাচার্য্য, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণকে আদর্শ করিয়া এবং তাঁহার অবিনশ্বর চরিত্র স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারি। এই সব আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এমন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গী হইতে হইবে যাঁহার চরিত্রের প্রভাবে দিন দিন উন্নত হইতে পারি এবং নিজের ঘৃণিত দোষ সকল এক মুহূর্ত্তের জন্যও যেন মস্তকোত্তোলন করিতে না পারে, সচ্চরিত্র বন্ধুর অভাবে আমাদের নিস্তার নাই, যেহেতু পাপের আপাতমধুর রস ও প্রলোভনে সদাই আমরা ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইয়া অসৎপথে চলিতে প্রয়াস পাইতেছি। কাজেই আমাদিগকে অতি সন্তর্পণে ও সাবধানে চলিতে হইবে। কারণ অসৎসঙ্গের পরিণাম অতি বিষময় ও ভীষণ ইতিহাসে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার গুহ।
তৃতীয় শ্রেণী (ক)

স্বার্থ ও সাধনা।

শুধু আপনারে লয়ে বসি নিরজনে,
তোমার চরণোদ্দেশে ফেলি অশ্রুজল ;
কহি আপনার কথা তোমারে গোপনে,
ভাবি—তুমি—কারো নও—আমারি কেবল।
সে যে স্বার্থ-সঙ্কুচিত, ক্ষুদ্র আমি সেথা !
তাইত হৃদয়ে হায় ! পাই না তোমায় ;—
সহস্র হৃদয় খিন্ন-ছিন্ন-দীর্ণ হেথা
অনশন, অবসন, কত অসহায় !
কাঁদিতে হইবে মোরে যে সবার তরে,
মিলিয়া তাদের সনে—পাশরি আপনা ;
চিনিব, লভিব তবে পূর্ণ-আপনারে,
তবেই ত হবে মোর স্বার্থক-সাধনা।
জননী সন্তান তরে শুধু কেঁদে মরে
নাহি চায় নিজ সেবা নিজ আরাধনা !

রোমাণ্টিক কবি সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা।

কবিতা অভিব্যক্তি মাত্র। যদি শুধু ছন্দ এবং মিল থাকিলেই কবিতা হইত তাহা হইলে সাহিত্যসমাজে কবিগণের ছড়াছড়ি পড়িয়া যাইত। তাহা হইলে ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত সূত্রগুলি সমেত পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণও মহাকাব্য হইত। সাহিত্য জগতে অসংখ্য কালিদাস আবির্ভূত হইতেন। শুধু মিল থাকিলেই কবিতা হয় না।

ভাবই কবিতার বিশেষত্ব। ভাবের তারতম্যেই কোনটী উচ্চ এবং কোনটী বা নীচ স্থান অধিকার করিয়াছে।

কবি যাহা কল্পনা করেন তাহা কল্পনা দ্বারাই অনুভব করা যায়। বাহ্য আলোচনায় পরিলক্ষিত হয় না। কবিত্ব বুঝিতে হইলে কবির ভাব তরঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া আপনাকে কবি করিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলেই কবির কবিত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। শুধু বাহ্য আলোচনায় কোনই ফল হয় না। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন "পৃথিবীতে" মিথ্যা কেবল কবিত্বেই আদরণীয়।" কবিত্বের সারাংশই এই মিথ্যা টুকু। এই মিথ্যা প্রকৃত মিথ্যা নহে। ইহা কখনো গভীর সত্যের নিগূঢ় আভাস, আবার কখনও দিব্য কল্পনার আনন্দময়ী লীলা। কবিত্ব অনুভব করিতে হইলে এই মিথ্যা টুকুকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। বাহ্য দৃষ্টিকে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে লইয়া যাইতে পারিলেই কবিত্ব অনুভব করা যায়। যাঁহারা এই মিথ্যাটুকুকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন না—তাঁহাদিগকে ইহা কথায় বুঝাইয়া দেওয়া সাধ্যাতীত। ইহা কেবল উপলব্ধি সাপেক্ষ। একটী উদাহরণ দিলে ইহা স্পষ্ট অনুভব করা যাইতে পারে। কবি ৺হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"শীতল বাতাস বয় জলের কল্লোল
রাঙ্গা রবি ছবি ল'য়ে খেলায় হিল্লোল।"

পাঠক যদি জিজ্ঞাসা করেন যে "জলের হিল্লোল ও রাঙ্গা-রবি-ছবি ল'য়ে কিরূপে খেলিতেছে" তাহা হইলে আমি নিরুত্তর। যাঁহার অনুভব করার ক্ষমতা থাকে তিনি অনুভব করুন। নচেৎ আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে অক্ষম। শুনিয়াছি জনৈক সাহিত্য সেবকের অনুরোধে তাঁহার একজন বন্ধু "Paradise Lost" পড়িয়া বলিয়াছেন, "Well sir, what does it prove after all" সাহিত্য সেবক উত্তর করিলেন, "It proves that you are a fool". তাঁহার

হৃদয় কবিত্বের ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করে নাই। তিনি জগতের একটী মহারত্ন লাভ করিতে পারেন নাই।

আধুনিক সমালোচকেরা কবিতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথা ঃ—ক্লাসিকাল (classical) এবং রোমাণ্টিক (Romantic).

ক্লাসিকাল কবিতায় আমরা দেখিতে পাই যে ইহাদের ভাবগুলি আমাদের সাধারণ কল্পনা শক্তির বহির্ভূত নয়। অর্থাৎ পার্থিব বস্তু-জ্ঞান এবং সাংসারিক অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যেই এই কবিত্ব অবস্থিত। একজন কবি বলিয়াছেন—

"সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।"

আমরা সহজেই এই কথাটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। আমরা জানি যে নদীস্রোত যেরূপ চিরকাল প্রবাহিত হয় সময়স্রোতও সেইরূপ চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে। ইহাকে বাঁধিয়া রাখা যায় না। এবং নদীস্রোত যেরূপ প্রত্যাবর্ত্তন করে না। সময় স্রোতও সেইরূপ প্রত্যাবর্ত্তন করে না! সময় কি ধনী কি দরিদ্র সকলকেই একভাবে দেখিয়া থাকে।

মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কল্পনা সম্ভূত। কিন্তু তাহাও এক হিসাবে আমাদের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করে নাই। এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন—

"মন্দাকিন্যাঃ পয়সি শিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভিঃ।
মন্দারাণা মনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ॥
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতা মুষ্টি নিক্ষেপ গূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরৈঃ প্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ॥"

অর্থাৎ মন্দাকিনীর স্বর্ণ বালুকাময় মন্দার বৃক্ষের ছায়ায় দেবগণ প্রার্থিতা কুমারীগণ ক্রীড়াচ্ছলে স্বর্ণ কণিকা মধ্যে একটী মণি লুকাইয়া তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতেছে। ইহা একটী

মনোহর কল্পনা চিত্র। কিন্তু আমরা ইহা অনায়াসে ধারণা করিতে সমর্থ। কারণ আমরা সোণার বালু দেখি নাই সত্য কিন্তু সোণাও দেখিয়াছি এবং বালুও দেখিয়াছি। এবং যদিও আমরা জানিনা দেবতারা মেয়েদের রূপ দেখিয়া ভোলেন কিনা তথাপি আমরা সুন্দর মেয়ে দেখিয়াছি।

আর একজন কবি লিখিয়াছেন—

"ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয় ?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
নীচাসক্ত অবিবেকী যাহাদের মন,
অনিত্য সংসার প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ,
হেরে নয়নের ওই ভ্রূকুটী তোমার
তাহাদের হয় মনে ভয়ের সঞ্চার।"

আমরা এই কবিতাটীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। আমরা দেখিতে পাই কবি নিঃশঙ্ক চিত্তে সহাস্য বদনে মৃত্যুকে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ নহেন।

*   *   *   *   *

কিন্তু রোমাণ্টিক কবিতায় মৃত্যু সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

"ওরে মৃত্যু জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে
বেঁধেছিস বাসা,
যেখানে নিভৃত কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর
স্নেহ ভালবাসা।"

এখানে মৃত্যু বক্ষের মাঝে বাসা বাঁধিয়াছে' এবং "যেখানে নিভৃত কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর স্নেহ ভালবাসা" এই ভাব কয়েকটী আমরা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। এখানে আমাদের সাধারণ ধারণা, কল্পনা, বুদ্ধি

ও অভিজ্ঞতা পরাস্ত হইয়া যায়। এখানে সূক্ষ্মতর কল্পনা এবং তীব্রতর অনুভব শক্তির প্রয়োগ করা আবশ্যক। এখানে কবি কোনো মহাসত্যের আভাস দিতেছেন। তাহা হৃদয়ঙ্গম করা বুঝি খুব সহজ হইবে না।

এইরূপ অনাদৃত কবিতায় কবি একস্থানে লিখিয়াছেন—

"নাহি জানি কত কি যে উঠিল জলে
কোনটা হাসির মত কিরণ ঢালে,
কোনটা বা টল্ টল্
কঠিন নয়ন জল
কোনটা সরম ছল
বধূর গালে।"

আমরা জাল ফেলিলে আমাদের জালে চিরপরিচিত শেওলা, সামুক, মাছ, কচ্ছপ, কুমীর এবং মণি মুক্তা প্রভৃতি উঠিয়া থাকে কিন্তু কবির জালে যাহা উঠিল তাহা অপরিমিত, অপরিচিত এবং "কোনটা হাসির মত কিরণ ঢালে, কোনটা বা টল্‌টল্ কঠিন নয়ন জল, কোনটা সরম ছল বধূর গালে।" এই জিনিষটী আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং চিন্তাশক্তির বহির্ভূত। এখানে পরিচিত বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া আমাদিগকে এক অভিনব কল্পনালোকে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহা নইলে এখানে সবই মিথ্যা।

আমরা আরও দেখিতে পাই যে রোমাণ্টিক কবিগণ জগতের ছোট ছোট জিনিষগুলি লইয়া কবিতা লিখিয়া থাকেন এবং কবিত্ব-গুণে তাহাই সুন্দর করিয়া তোলেন। পৃথিবীতে প্রত্যহ যে সমস্ত "বিস্মৃতিরাশি ভাসিয়া যাইতেছে তাহাদের দুই চারিটী অশ্রুজলই ইঁহাদের লিখিবার বিষয়। তাহা সুরসুন্দরী উর্ব্বশী সদৃশ" বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে

আঘাত করিয়া থাকে। তাহা বিস্মৃত হইবার নয়। বঙ্কিমচন্দ্র মোসলমান ও রাজপুত শক্তির সংঘর্ষণে রাজসিংহের যে চিত্র দিয়াছেন তাহা আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত এবং মুগ্ধ করিয়াছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অতি তুচ্ছতম প্রবাসী কাবুলীওয়ালা এবং পুরাতন ভৃত্য কেষ্টার সুখ দুঃখের কথা সকলের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াছে। আমাদের জীবনে যে সমস্ত তুচ্ছতম ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা যাহা আমাদের নিকট অতি পুরাতন, রোমাণ্টিক কবি তাহাই নূতন করিয়া নূতন ভাবে প্রকাশ করেন। অতীত সুখস্মৃতিরাশির ন্যায় তাহা আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আনন্দের অপূর্ব্ব স্পন্দন জাগাইয়া তোলে। আমাদের হৃদয় ভরপূর হইয়া যায়। কোন নুতন ভাবও আমাদিগকে সেরূপ তৃপ্তি প্রদান করিতে পারে না॥

"শ্যামল" বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে থাকি আমি মুগ্ধ নয়নে,
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভ'রে আঁসে আখিজল।"

যখন আমরা উদাসীন আনমনাভাবে বিপুলা শস্যশ্যামলা ধরার দিকে বিস্মৃতনেত্রে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি তখন হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে অশ্রুরাশি উদ্বেলিত হইয়া নয়ন ও বক্ষ প্লাবিত করে। ইহা বিষাদজনিত অশ্রুরাশি নয়। ইহা আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আনন্দের এবং দুঃখের সংমিশ্রণে সম্ভূত। এইরূপ অপূর্ব্ব ভাবান্তর হৃদয়বান্ ভাবুকের হৃদয়ে হয়তো অনেকবার ঘটিয়াছে। কিন্তু আমরা তাহা লক্ষ্য করি নাই ভাবিয়াও ভাবি নাই। রোমাণ্টিক কবি আমাদের জীবনের অপরিলক্ষিত ঘটনাগুলি আমাদের স্মৃতিপথে আঁকিয়া দিয়া আমাদের হৃদয়ে আনন্দ উৎস ঢালিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু রোমাণ্টিক কবি যে কেবল আমাদিগকে আনন্দ প্রদান

করিয়াছেন এমত নহে। সামান্য বস্তু দ্বারা, সামান্য ঘটনাদ্বারা আমাদিগকে অনেক উচ্চ বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন এবং আমাদের ভুল গুলি আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন; আমরা আমাদের যে ভুল গুলি দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না রোমাণ্টিক কবি বাস্তব জগতের ছোট ছোট দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই আমাদিগকে প্রত্যক্ষ-রূপে দেখাইয়া এবং বুঝাইয়া দিয়াছেন। যেমন—

"সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্ব্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন ক'রে হারাণো রতন
সে শকতি নাহি আর নুয়ে পড়ে দেহ ভার
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।
অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি কোন ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভে ছিল যার এক পল ভর
বাকী অর্দ্ধ ভগ্নপ্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ পাথর।"

জীবনে আমরা অনেক পরশ পাথর খুঁজিয়া থাকি কিন্তু অবশেষে সেই খোঁজাটাই আমাদের জীবনের কার্য্য হইয়া পড়ে। পরশ পাথর হাতে পাইলেও আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না। এস্থানে কবি আমাদিগকে ইহাই শিখাইতেছেন। আর একস্থানে কবি লিখিয়াছেন—

"শশী যেথা ছিল সেথাই রহিল
সেও বসে এক ঠাই
অবশেষে যবে জীবনের দিন
আর বেশী বাকী নাই।
এমন সময় সহসা কি ভাবি
চাহিল সে মুখ ফিরে,

দেখিল ধরণী শ্যামল মধুর
সুনীল সিন্ধুতীরে।

* * * *

দেখিল চাহিয়া জীবনপূর্ণ
সুন্দর লোকালয়,
প্রতি দিবসের হরষে বিষাদে
চির কল্লোলময়।

* * * *

দিনের আলোক মিলায়ে আসিল
তবু পিছে চেয়ে রহে
যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চায়
তার বেশী কিছু নহে।"

জীবনে নিজের প্রাপ্তসুখে সন্তুষ্ট না হইয়া যাহারা অলৌকিক সুখ মানসে ধাবিত হয় তাহাদের অবস্থা শশিবাঞ্ছিতের ন্যায় হইয়া থাকে। প্রাপ্তসুখে সন্তুষ্ট না থাকিয়া অলৌকিক সুখান্বেষণে ধাবিত হইতে হইতে যখন তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় তখন সভয়ে দেখিতে পায় যে তাহারা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। আর ফিরিবার উপায় নাই। যে অমূল্য জীবন লাভ করিয়াছিল তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছে। যাহারা সেই অমূল্য জীবন সযত্নে রক্ষা করিয়া সুখ শান্তিতে জীবন যাপন করিতেছে তাহাদের পানে চাহিয়া গভীর অনুশোচনায় সে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করে। আমাদের এই ভুলটাই কবি আমাদিগকে একটী ছোট দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিতেছেন। ছোট জিনিসের মধ্যেই তিনি মহাসত্যের ও প্রকৃত সৌন্দর্য্যের বীজ বপন করিয়া দেন। ক্লাসিকাল কবিগণ যাহার মধ্যে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই রোমাণ্টিক কবি

সেই তুচ্ছ বিষয়ে এবং তুচ্ছ ঘটনায় কবিত্বের তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছেন। কবি তাঁহার কবিত্ব মাধুর্য্য দ্বারা অতি সামান্য দৃশ্যও অতীব মনোরম সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছেন। যেমন ঃ—

"আজকে দিনের মেলা মেশা
যত খুসি যতই নেশা,
সবার চেয়ে আনন্দময়
ঐ মেয়েটির হাসি
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি
বাজে বাঁশি পাতার বাঁশি
আনন্দ স্বরে
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
সবার উপরে।

* * * *

আজকে দিনের দুঃখ যত
নাইরে দুঃখ উহার মত
ঐ যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান পানে চাহি
একটি রাঙ্গা লাঠী কিন্‌বে
একটি পয়সা নাহি
চেয়ে আছে নিমেষ হারা
নয়ন অরুণ
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

কবি আপনাকে জীবনের সুখ দুঃখ এবং শান্তি অশান্তি হইতে মুক্ত করিয়া একটী ছোট মেয়ের মুহূর্ত্তস্থায়ী আনন্দে এবং একটী

ছোট ছেলের মুহূর্ত্তস্থায়ী দুঃখে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। কবির সহানুভূতি এমনি সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপিনী। অন্য একটী কবিতায় এইরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন—

> "কি গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ
> সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
> শুনেতেছি একমাত্র মর্ম্মান্তিক সুর
> "যেতে আমি দিবনা তোমায়।" ধরণীর
> প্রান্ত হ'তে নীলাভ্রের সর্ব্বপ্রান্ততীর
> ধ্বনিতেছে চিরকাল আদ্য অন্ত রবে
> "যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব" কহে সবে
> "যেতে নাহি দিব।"

তনয়ার সকরুণ আব্দারের কথাটী তিনি জগতে প্রত্যেক বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট দেখিতেছেন। সবাই তাঁহাকে বলিতেছে "যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।" স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া যে দূর দূরান্তে দিগ্‌দিগন্তে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে তাহাকে বাঁধিবার জন্য সকলেই "ব্যগ্র স্নেহভরে নূতন জাল বিস্তার" করিতেছে। আকাশে, বাতাসে জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই তিনি এই বিরহ ব্যথার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন। আজ তাহার ফলভারাবনত হৃদয়কুঞ্জ "পরিপূর্ণ বেদনার ভরে" ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

চিরপরিচিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কবির সৃষ্টিকুশল কল্পনাপটে কি অপরূপ জীবন্তমূর্ত্তি ধারণ করে তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি।

> "যেমনি নিবিল আলো উচ্ছ্বসিত স্রোতে
> মুক্তদ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দ্দিক হ'তে
> চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি
> ত্রিভুবন প্লাবিনী সুধাহাসি।
> হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা

অনন্তের অন্তর-শায়িনী ! নাহি সীমা
তব রহস্যের।

* * * * *

কখন দুয়ারে এসে
মুখানি বাড়ায়ে, অভিসারিকার বেশে
আছিলে দাঁড়ায়ে, একপ্রান্তে, সুররাণী,
সুদূর নক্ষত্র হ'তে সাথে করে' আনি'
বিশ্বভরা নীরবতা।”

দ্বিপ্রহর রাত্রে পাঠশেষে আলো নির্ব্বাপিত করিলে আমরাও ওইরূপ জ্যোৎস্না কর্ত্তৃক চমকিত হইয়াছি এবং জ্যোৎস্নায় সানন্দে শরীর শীতল করিয়াছি কিন্তু রোমাণ্টিক কবির ন্যায় তাহাকে এরূপ “সুন্দরী মৌনসুধা হাসিনী, অনন্তের অন্তরশায়িনী, অভিসারিকার বেশে সজ্জিত সুররাণীরূপে” দেখিতে পাই নাই। আমরা জ্যোৎস্নার “বিশ্বভরা নীরবতা” দেখিতে পাই নাই। আমরা জ্যোৎস্না রাশিতে আনন্দ উপভোগ করিয়াছি বটে কিন্তু এরূপ অপার বিমল আনন্দ উপভোগ করি নাই। কবি আমাদের জ্যোৎস্না সৌন্দর্য্য সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। এইরূপ তাঁহারা “ধরণীর তলে গগনের গায়, সাগরের জলে এবং অরণ্যের ছায়ায়” আর একটু খালি রঙ্গীন করিয়া” দেন।

এইরূপ রোমাণ্টিক কবি কখনও আমাদিগকে বাস্তব জগৎ হইতে কাল্পনিক জগতে লইয়া, কখনও আমাদের স্মৃতিপটে অতীত স্মৃতিরাশি অঙ্কিত করিয়া আবার কখনও জগতকে আমাদের নূতন বেশে সজ্জিত করিয়া আমাদের হৃদয়ে নবভাবের উদ্দীপনা করেন। তাঁহার চক্ষে জগতের সামান্য জিনিসও কোন উচ্চ বিষয়ের প্রত্যক্ষ স্বরূপ। তিনি জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই লোকাতীত মাধুর্য্য উদ্ভাসিত দেখিতে পান। তিনি বসন্তের আনন্দের মত আপনাকে

দিগ্বিদিকে বিস্তারিত করিয়া জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া যান। তাঁহার হৃদয় সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। তিনিই প্রকৃত কবি।

শ্রীবিধুরঞ্জন মজুমদার।

কামনা।

তুমি　　হৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জে
　　　　সদা উঠ ফুটে,
তব　　মধু লোভে মত্ত মনো মম
　　　　গুঞ্জরিয়া ছুটে।
তাই　　সে যে নাহি মানে বাধাবন্ধ
　　　　গন্ধেতে পাগল,
শুধু　　মিটাতে চঞ্চল আশা শত
　　　　নিয়ত চঞ্চল।
তুমি　　বিকাশ মধুর হাসি সদা
　　　　ভুলাইতে তারে,
সে যে　　প্রলুব্ধ কতই নিতি নিতি
　　　　আসে বারে বারে।
কবে　　এ খেলার হবে সমাধান
　　　　ফুরাবে কৌতুক ?
যবে　　মুছে যাবে স্নিগ্ধ হাসি রাশি
　　　　শুষ্ক হবে বুক।
রবে　　ভরপূর শুধু অতৃপ্তির
　　　　প্রদীপ্ত অনল,
সদা　　জ্বলিব জীবন ভরি, হবে
　　　　অমৃতে গরল।

পরে হবে দীর্ণ দগ্ধ ভস্মীভূত
অন্তর বাহির,
চির দহি-জ্বালা লভিবে নির্ব্বাণ
সব শান্ত স্থির।
শেষে হবে ধীরে ধীরে চিন্তার
সমস্তের শেষ,
জানি কোথা তুমি চলে যাবে কোন্
অনন্তের দেশ।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায়।

সরসী তীরে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্রকৃতি গাম্ভীর্য্যময়ী ভাবময়ী। উপরে সুবর্ণ নক্ষত্রখচিত-কিরীট পরিহিত সুনীল গগন হাস্য করিতেছে। সে হাসি গাম্ভীর্য্য পরিপূর্ণ! সেই গাম্ভীর্য্য রেখা আরও গম্ভীর করিয়া নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া এক অভাবনীয় সঙ্গীত তরঙ্গ নৈশ পবন বক্ষে ভাসিয়া ভাসিয়া আমার কর্ণ-কুহরে ঝঙ্কৃত হইল। কে যেন মধুর স্বরে মাধুর্য্য পূর্ণ সঙ্গীত গাহিল:—

"সান্ধ্য-সমীরে থরে থরে থরে কে দিছে মধুর বাস,
সরসীর বুকে কুমুদিনী মুখে কে দিছে মধুর হাস?
চাঁদে কে দিয়েছে জোছনা রাশি,
প্রেমিকের গলে পরাতে ফাঁসি,
কামিনী অধরে কেন সুধা ঝরে
কেন সেথা রহে সদা মধু মাস?
এ ভব ভবন কেন বা সুন্দর,
কেন বা তটিনী কুলুধ্বনি চলেছে সাগর পাশ?"

সঙ্গীত সান্ধ্য-গগনে প্রতিধ্বনিত হইল, চন্দ্র হাসিল, নক্ষত্র হাসিল, প্রকৃতি মুগ্ধা হইল, বায়ুর গতি প্রশান্ত হইল—ধীর মন্থর হইল। আমি কোকিলের দিগন্ত-মুখরিত কুহু ঝঙ্কার শুনিয়াছি ; শুনিয়াছি পাপিয়ার মর্ম্মবিদারক 'চোখ গেল, চোখ গেল' তান ; শুনিয়াছি সেই অনন্ত নীলাকাশবিহারী চাতকের প্রাণ ফাটা তৃষ্ণার করুণ কণ্ঠ। কিন্তু এই সঙ্গীত আমার হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে, শোণিতের প্রতি রেণুতে রেণুতে, প্রতি শিরা উপশিরাতে পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

সেই সময়ে সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এমন করুণরসাত্মক গীত শ্রবণ করিয়া কে না মোহিত হন ? কাহার পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত না হয় ? যাঁহার হয় না, তিনি কখনও অনন্ত বিশ্বরাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চক্ষে দেখিতে পারিবেন না। তিনি নিতান্তই পাষাণ-হৃদয়।

আবার সেই গন্ধর্ববিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে, বায়ুস্তর, মেঘলোক, আকাশমণ্ডল ভাসিয়া গেল। সে স্বরতরঙ্গ এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। আবার গীত ধ্বনিত হইল :—

"বেলা চলে গেল তপন ডুবিল,
কমল মুদিল আঁখি।
এ ভব সংসার, হইল আঁধার
কি দেখিতে যার থাকি ?
আশে আশে ধনী, ফুল্ল সরোজিনী,
বসিল মৃণালোপরে।
ফুটিবে ফুটিবে মনেতে বাসনা
ছিঁড়িল অকালে তারে॥
না বিলাতে বাস ত্যজে ভব সাজ,
বিফল প্রয়াস বুকে বুকে সদা রাখি॥"

বসন্তের পূর্ণিমার মাঠ খানি সুষুপ্তির ক্রোড়ে মাতৃক্রোড়ে শিশুর মত নিদ্রিত। সেই মাঠময় এই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল; বাতাস একটু জোরে বহিল, বোধ হইল যেন সঙ্গীতের করুণরসে প্রকৃতিদেবী গভীর পরিতৃপ্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আমার মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাবান্তর হইল। যে মন দুর্ব্বলতাপূর্ণ ছিল, আজ দেখি তাহা সতেজ, সরস হইয়া উঠিল। যে হৃদয়ের আশা-প্রদীপ তৈলাভাবে নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছিল, আজ তাহাতে তৈলসেক হইল। যে মন সংসারের পাপ পঙ্কিলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল, আজ দেখি তাহা এই সঙ্গীতের মহিমময়ি শক্তিতে কি এক অভিনব আলোকে উদ্ভাসিত হইল। মন বড়ই চঞ্চল হইল। চঞ্চল হরিণ যেমন দূরাগত বংশী-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মোহিত হয়—আমিও সেইরূপ সেই সঙ্গীত উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম। সঙ্গীত থামিয়া গেল; মন আরও চঞ্চল হইল। বসিয়াছিলাম, উঠিয়া দাঁড়াইলাম, মুহূর্ত্তের জন্য সব নিস্তব্ধ। আমার বুকের ভিতর ঘন ঘন স্পন্দন হইতেছিল। উন্মত্তের ন্যায় আবার বসিলাম।

এই সঙ্গীতের উন্মাদকারী শক্তিতে আমার নয়ন কোণ হইতে কি যেন কিসের অশ্রু-প্রবাহ ঝরিতে লাগিল। তাহা আর কেহ এই পূর্ণিমা রজনীতে দেখিল না। কেবল দেখিলেন তিনি, যাঁহার চক্ষু জগদ্ব্যাপ্ত। আমার অন্তর্য্যামী ভিন্ন আমার ক্ষুদ্র প্রাণের ঘাত প্রতিঘাত আর কেহ বুঝিতে পারিল না।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ সাহা।

বাসন্তী পূর্ণিমায়।

আজি জ্যোৎস্না-রাতে,
বাসন্তী বাতে,
অঙ্গ চুমিতে চায়।
মৃদুল পরশে,
আকুল-হরষে,
পরাণ মূরছা পায়।
উচ্ছল কোন্ বাঁশরীর তান,
মাতোয়ারা কোন্ কোকিলের গান,
আকাশের তলে উঠিল ভাসিয়া
ছড়াল জ্যোছনা-বায়।
আজি এই সাঁঝে,
হৃদয়ের মাঝে,
কি গান বাজিল হায়!
কবে নীপ-মূলে,
যমুনার কূলে,
বসিয়াছে শ্যাম রায়;
করুণ-বাঁশরী
উঠিছে ফুকারি'
কাহারে ডাকিছে 'আয়'।
সে বাঁশরী শুনি,
রাধা সে মানিনী,
রহিতে নারিল আর।
অভিসারে তাই,

ছুটিয়াছে রাই,
উতলা পরাণ তার।
স্খলিত আঁচল
চুমিছে ভূতল,
কবরী খসিয়া পড়ে;
সারা দেহ মন
কাঁপে ঘন ঘন,
আকুল আবেগ ভরে।
সে বিজন পথে,
নাহি কেহ সাথে
কণ্টক বিঁধে পায়;
তবুও সে রাধা,
নাহি মানে বাধা,
পিছনে না ফিরি' চায়।
ঐ বিরহী পাপিয়া
রহিয়া রহিয়া
গাহিছে বিষাদ গান;
দূর যমুনায়,
নাহি শোনা যায়,
আর সে বাঁশরী তান।

শ্রীব্রজেন্দ্র লাল সরকার।

দ্বিতীয় শিক্ষকমহাশয়ের বিদায় উপলক্ষে।

বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর, আমাদের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত গঙ্গাপ্রসাদ দাসগুপ্ত বি, এ, মহাশয় কিঞ্চিদধিক ত্রিংশদবর্ষ

এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া সুস্থ শরীরে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

উক্ত দিবস অপরাহ্নে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্ম্মচারিবর্গ তাঁহাকে সান্ধ্য সম্মিলনে আহ্বান করিয়া প্রীতি ও শুভাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আমাদের সদাশয় প্রিন্সিপাল মহোদয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার ছাত্রদিগের আগ্রহাতিশয্যে বিদ্যালয় প্রকোষ্ঠে এক সভার অধিবেশন হয়। অপরাহ্ণ প্রায় তিন ঘটিকার সময় গঙ্গাপ্রসাদবাবু শিষ্যপরিবৃত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হন এবং মাল্যবিভূষিত হইয়া মঞ্চোপরি উপবেশন করেন। ইতোমধ্যে সভাগৃহ, অধ্যাপক, শিক্ষক ও সমুৎসুক ছাত্রগণে প্রায় পরিপূর্ণ হয়। আমাদের মাননীয় প্রধান শিক্ষকমহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রারম্ভিক সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে, সভাপতি মহাশয় এক নাতিদীর্ঘ অথচ সারগর্ভ ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন। অতঃপর বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রবর্গ, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ও এই বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদের পক্ষ হইতে বিচিত্র মণ্ডিত বিদায় উপহার প্রদান করা হয়। অনন্তর ছাত্রগণ তাহাদের প্রাচীন উপাধ্যায়ের হস্তে একখানা সুশোভন যষ্টি অর্পণ করে।

শ্রোতৃবর্গের পক্ষ হইতে প্রথম সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন সাহা এম্ এ, মহাশয় এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন এবং শিক্ষকতা যে এক জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন।

তৎপর গঙ্গাপ্রসাদ বাবু এক আবেগময়ী বক্তৃতায় প্রিয় শিষ্যগণের কল্যাণ কামনা করেন এবং তাহাদিগকে কতিপয় উপদেশ দেন। বক্তৃতান্তে তিনি ছাত্রগণের নিকটস্থ হইয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

অতঃপর সঙ্গীতযোগে সভাভঙ্গ হইলে, ছাত্রগণ শিক্ষক ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়দিগের জন্য চা ও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করিয়াছিল। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

শিবাস্তে পন্থানঃ।

মায়ের প্রাণ।

১

'তাই ত, বোন, কি হবে ?'

'কোন চিন্তা নাই দিদি, বাছা শীঘ্র সেরে উঠ্‌বে।'

'তাই আশীর্ব্বাদ কর, বোন, বাছা আমার মা ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারে না—সে আবার কোথা বিদেশে গেছে, এখনই বা কি কর্‌ছে, বিধাতাই জানেন।'

'সত্যই দিদি, বিদেশ বিভুঁয়ে কি যেতে আছে, সকলে মানা কল্লে, তবু সে গেল। ঈশ্বর না করুন এখন যদি বাছার কিছু হয়; তবে যেমন মা ছাড়া থাকতে পারে না, তেমন বুঝি মরণ সময় মাকে দেখতে পাবে না।'

মরণ শুনিয়াই মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, মায়ের প্রাণে অধিক বেজেছে বুঝিয়া গবার ঠাকুরমা বলিলেন —'কালই দেখ, দিদি, সুখবর আস্‌ছে। "এমন কি আমার বরাত হবে বোন,' এই বলিয়া রামধনের মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হরিনাম জপিতে জপিতে এক অতি পুরাতন কুটীর মধ্যে গমন করিলেন, তাহার প্রতিবাসী গবার ঠাকুরমাও সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া প্রস্থান করিলেন, সেই তাহার দুঃখে দুঃখী, তবে ভুল করিয়া মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়া ফেলিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি অনুতাপ ও করিয়াছেন। রামধনের মায়ের কুটীর হইতে প্রস্থান করিয়া পথে কেবল বিড়্ বিড়্ করিতে করিতে চলিলেন—'তাইত ছেলেটারই বা কি হবে আর এই বুড়ীরইবা বরাতে কি আছে। বাছা রামধন মায়ের দুঃখ দেখে কোথা চাকরি কোর্ত্তে গেল আর কোথা থেকে কাল রোগ এসে বাছাকে ধরল। বিধাতারই বা আক্কেল কি ? এই বুড়ীর সেই

অঞ্চলের নিধি রামধনকেই নিতে বসেছেন। তারই বা দোষ দি কি। এই বুড়ীই বোধ হয় জন্মান্তরে কত পাপ করেছে; তাই স্বামী গেল এখন ছেলে যেতে বসেছে। যাহোক্ এখন কাল তার সুখবর এলে বাঁচি। আবার সে ত দুপায়ের রাস্তা নয় যে সে গরুর গাড়ী করে আস্‌বে; না হয় এই বুড়ী যেয়ে একবার দেখে আসবে! সে কোথা, বাবা, দিল্লী লাহোর কল্‌কাতা, সেখানে আবার যেতে হলে নাকি কি একরকম গাড়ী চড়ে যেতে হয়। আমি যেতে মানা কল্লাম, তাত শুন্‌লেন না, যেতে হবেই, যাও, বাবা, এখন ভুগে কে?"—এইরূপ রামধনের কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন, তাহার বাড়ীটী বড় পরিষ্কার, চারিধারে বাগান, বাগানে যে কেবল এখনকার বাবুকর্ত্রী-দিগের মত ফুলের গাছ আছে তাহা নহে, বাগানের চারিধারে কলাগাছ ও আলুবেগুন প্রভৃতির গাছ আর মধ্যে মধ্যে দুচারিটী জবা মল্লিকা প্রভৃতি ফুলের ঝাড়, বাড়ীর সম্মুখের বাগানটীতে একটী পুষ্করিণী আছে। তাহাতে তাহাদের সকল কাজ হয়। তার চারিপাশে নানাবিধ শাকশবজী হইয়াছে, পুকুরটী মাছে পরিপূর্ণ, এই সকলেই তাহাদের চলে। বস্তুতঃ লবণ তৈল প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছুই কিনিতে হয় না।

দরজা বন্ধ দেখিয়া তিনি "গবা" "গবা" বলিয়া ডাকিলেন। তাহার পৌত্রের নাম গোবিন্দ, তিনি আদর করিয়া "গবা" বলিয়া ডাকিতেন। ডাকিবামাত্র এক অল্পবয়স্ক বালক দরজা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুরমার অঁাচল ধরিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

২

এদিকে বৃদ্ধা গৃহমধ্যে যাইয়া হরিনামের মালাটী গৃহকোণে ঝুলাইয়া রাখিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলেন, তখন তাহার চোখের জলে বস্ত্র ভিজিতেছে। চক্ষুদুটী লাল জবা ফুল হইয়াছে। হাত পা থর থর কাঁপিতেছে। মাথায় আর বুদ্ধি জুটে না, জুটিয়াই বা কি হইবে? সেটা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে ত অর্থ চাই? এ বৃদ্ধার এক পয়সাও ছিল না। প্রতিদিন ভিক্ষা করিয়া দিন চালায়—তার কুটীরে আবার অর্থ কোথায় থাকিবে? কিছুক্ষণ পরে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি আর বসিয়া থাকতে পারিলেন না; শুইয়া পড়িলেন।

শুইয়া কেবল আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিলেন—'আমার সমস্তই ছিল, আমার কি না ছিল। কিন্তু সমস্তই আমার পরমদেবতা স্বামীই নষ্ট করিয়াছেন। নষ্ট না করিলে বাছাকে আমার বিদেশে যেতে হবে কেন? যাক্ তিনি নষ্ট করিয়াছেন ত করিয়াছেন তা আবার আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন কেন? এখানে বুঝি তাঁর ভাল লাগিল না; তাই স্বর্গে গিয়াছেন, এখন এখানে আমরা দুজন—আমি আর আমার সেই অন্ধের যষ্টি রামধন। সেও বুঝি তার পিতার পথ ধরিবে, তবে কেন আমি এখানে একা থাকি? আমার স্বামী গিয়াছেন; এখন আমার পুত্র যে পথে যাইবে সেই পথে যাইব। বিধাতার কি অবিচার? সংসারে যাহার 'আমার' বলিতে একটী থাকে তাকেই কি লইতে চান? না, লইবেন না, যদি লইবেন তবে এই হতভাগিনীকে এইটুকু দয়া করেন যেন যখনই সে তাহার বাছার অমঙ্গল—আহা, ভগবান্ কি এতই নিষ্ঠুর!—শুনিবে তখনই যেন তাহাকে এই পৃথিবীতে একা থাকিতে না হয়।'—এইরূপ চিন্তায় অধীর হইয়া তাহার তন্দ্রা আসিল। বালিসে মাথা গুঁজিয়া নিদ্রা গেলেন।

নিদ্রায়ও শান্তি নাই; মায়ের প্রাণ পুত্রের কিছু অমঙ্গল হইলেই প্রতিমুহূর্ত্তে শঙ্কিত ও প্রতিরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। তিনিও নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন। অনেক বড় বড় রাস্তা ও অন্ধকারময় গলি পার হইয়া শেষে রামধনের দরজায় উপস্থিত। তিনি দরজা খুলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীটী দোতালা। কিন্তু বড় নির্জ্জন, দেখিলেই মনে হয় ইহাতে কোন ভূতপ্রেত বাস করে। তিনি উপরতালায় উঠিয়া একটী ছোট অন্ধকারময় কামরায় ধাক্কা দিলেন। ধাক্কা দিবামাত্র দরজা খুলিয়া গেল। দেখিলেন এক মলিন শয্যায় তাহার সোনার চাঁদ শয়ন করিয়া আছে। তাহার দুইগণ্ড বহিয়া অবিরত অশ্রু পড়িতেছে। মুখ মলিন হইয়াছে। সমস্ত শরীর কালিমায় পূর্ণ। তাহাকে দেখিবামাত্র যেন সে সবল হইয়া "মা" "মা" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তিনি যাইয়া তাহাকে কোলে লইলেন। অনেকদিন পর মায়ের কোলে বসিয়া সে যেন শান্ত হইল। কোলে করিয়া তিনি বলিলেন—'বাবা আশীর্ব্বাদ করি,সেরে

উঠ।' ইহা শুনিয়া রামধন যেন বলিল—'মা, আমি এবার আর বাঁচিব না।' তখন তাহার মুখ আবার শুকাইয়া গেল। শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। সময় নিকট। সেই মাতৃভক্ত বালক যেন মায়ের কোলে থাকিয়া মরণ সার্থক করিল। তিনি আরও দেখিলেন—যেন তাহার রামধন দেবদূতদিগের সহিত স্বর্গে যাইতেছে আর বলিতেছে—'মা, তোর প্রতি ভক্তি ও আশীর্ব্বাদে আমি এখন স্বর্গে চলিলাম। তুইও শীঘ্র আসিবি।' এই সকল শ্রবণ করিয়া রামধনের মাতার মনে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি খেলিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তাহা মায়ামন্ত্রে বিলীন পাইল! তিনি জাগরিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—'তাইত বাছার কি মৃত্যুই ঘটিল? না তা হতে পারে না। আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি; স্বপ্ন কখনও সত্য হয় না। কি জানি, হইতেও পারে; হইলই বা তাতে কি? আমিও ত শীঘ্র যাইব। না, যাইব না, আমার রামধনকেও যেতে দিবনা।' এইরূপ মনের সহিত অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্ক করিয়া তিনি দেখিলেন গবাক্ষের মধ্য দিয়া প্রভাতের শীতল সূর্য্যরশ্মি উকি ঝুকি মারিতেছে। সকাল হইয়াছে জানিয়া তিনি উঠিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট গণনা করিতে যাইবেন স্থির করিয়া বাহির হইলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একজন ডাকহরকরা। তাহাকে দেখিয়াই তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। বুক দুর দুর করিতে লাগিল। পূর্ব্বরাত্রির স্বপ্ন মনে উদিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সে বলিল—বুড়ী, তোম্‌কো আর একঠো টেলিগ্রাম আয়া হ্যায়।" বুড়ী বলিল—'দাও, বাবা।'

তখন রামধনের মা ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। টেলিগ্রামটী লইয়া পড়াইতে চলিলেন। রাস্তায় উঠিয়া তাহার পা আর চলে না। প্রতিক্ষণে তাহার পূর্ব্বরাত্রির স্বপ্ন চমকাইতেছিল। কখন ভাবিলেন এতেই বুঝি তার বাছার অমঙ্গল আছে,—আবার কখন ভাবিলেন—না, সেটা স্বপ্ন। তখন তাহার ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের বাড়ী যাওয়ার কথা মনে পড়িল। তখন ভাবিলেন—আগে ভট্‌চায্‌ মশয়েয় বাড়ী যাই, যেয়ে গণনা করে আসি, আবার ভাবিলেন—তিনি যদি বলেন রামধন নাই। কিন্তু ইহাতে যদি সে সব কিছু না থাকে, তবে আগে এটী পড়াতে যাই। যখন তাহার মনে পুত্রের মৃত্যুরকথা উঠে, তখনই সেই কুস্বপ্ন তাহার মনে স্থান

পায় ; তখনই তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। এইরূপ করিয়া যাইতে যাইতে পথে গবার ঠাকুরমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি অন্যান্য ছেলেদের সহিত পাঠশালাভিমুখে চলিয়াছেন। তাহার ইচ্ছা গুরুমহাশয়কে একটু বলিয়া গবাকে উত্তম মধ্যম দাওয়া। পথি-মধ্যে রামধনের মার সহিত দেখা হওয়ায় সেটা গবার ভাগ্যে ঘটিল না। রামধনের মা গবার ঠাকুরমাকে সম্মুখে পাইয়া একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—'চলত, বোন, একবার রমেশের কাছে।' গবার ঠাকুরমা বলিলেন—কি জন্য, এত তাড়াতাড়ি কেন ? তোমার হাতে ওটা কি ? রামধনের মা বলিলেন—'এটা রামধনের কাছ থেকে খবর এসেছে। বাছাকে কাল স্বপ্ন দেখেছি, তাই তাড়াতাড়ি ক'রে এটা পড়াতে যাচ্ছি।' গবার ঠাকুরমা দেখিলেন সে আর কথা কহিতে পারিতেছে না ; পা থর থর করিতেছে। চক্ষুদুটী জ্যোতির্হীন হইয়াছে, তিনি পুত্রকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ ও যত্ন করিতেন। তখন তিনি আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। রামধনের মার সহিত চলিলেন।

রমেশ এক কায়স্থের ছেলে। তাহার পিতার অর্থব্যয়ে ও আগ্রহে সেই গ্রামে সেই এনট্রান্সটা পাশ করিয়াছিল। সে জন্য অনেকে তাহার নিকট ভারতের বা বিলাতের ইতিহাস শুনিতে আসিত। কেহ বা দরখাস্ত লিখিয়া লইবার জন্য আসিত। তাহার বাবুগিরিও কম ছিল না। সেজন্য অনেকে তাহাকে 'সাহেব' বলিয়া ডাকিত। কিছুদিন হইল তাহার পিতা মারা গিয়াছেন। সেই এখন বাড়ীর কর্ত্তা। বাড়ীটী বেশ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গবার ঠাকুরমা রামধনের মায়ের হাত হইতে টেলিগ্রামটী লইয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। গবার ঠাকুরমার হাতে টেলিগ্রামটী দিয়াই তাহার প্রাণ চমকাইয়া উঠিল। বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিল। আর সেই পূর্ব্বরাত্রির ছবি তাহার চোখের সামনে নাচিতে লাগিল। তিনি সেইখানেই ভয়ে বিহ্বলা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গবার ঠাকুর মা ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'তোমার বাছা ভাল আছে, তবে বড় দুর্ব্বল, উঠিতে পারে না।' এই সংবাদে তিনি যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলেন। কিন্তু সেই চাঁদ অধিকক্ষণ হাতে রহিল না ; শীঘ্রই

কোথায় চলিয়া গেল। তিনি সেই সংবাদও বিশ্বাস করিলেন না। কেবল সেই পূর্ব্বরাত্রির ছবিটী স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া তাহার মনে অঙ্কিত হইতে লাগিল। তিনি একটু ক্ষুণ্ণ মনে বলিলেন—'তবে এখন একবার মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ী যাই।' গবার ঠাকুরমা তাহার ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ কিছুই বুঝিলেন না; তবে 'আচ্ছা, যাও,' বলিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

৪

মুখার্জ্জি মহাশয় তখন জলযোগে বসিয়াছেন। রামধনের মাকে দেখিয়া একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন—এবাব আবার কি? তখন তাঁহার মেজাজ একটু গরম ছিল। তাঁহার মেজাজ প্রায়ই নরম থাকে তবে সময়ে সময়ে গরম হইয়া উঠে। তাঁহার প্রকৃত নাম প্যারীমোহন মুখার্জ্জি। কিন্তু সকলে 'মুখুয্যে মশায়' বলিলেই চিনিত। তিনি একজন সঙ্গতিপন্ন লোক। তাহার বাড়ীটী দোতালা চারিধারে প্রাচীরে ঘেরা, তিনি ঐ গ্রামের মোড়ল ছিলেন। গ্রামের কিছু হইলে তাহারই নিকট সংবাদ আসিত। তিনি গ্রামের সমস্ত খবর রাখিতেন। রামধনের মাকে তথাপি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—এখন নয় যাও। এই শুনিয়া তাহার মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। আর একটী কথাও কহিতে পারিলেন না। তখন ভাবিতে লাগিলেন—'তাইত, কাল ত বেশ যত্ন করে দুটাকা দিয়াছেন আজ আবার এরূপ কেন।' তখনই আবার পূর্ব্ব-রাত্রির স্বপ্ন তাহাকে চমকাইয়া দিল। তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; আস্তে আস্তে বাহির হইয়া মনের কাছে স্বপ্ন ও সংবাদের ঝগড়া বাঁধাইয়া কুটীরাভিমুখে চলিলেন।

তখন বৈকাল অতীত হয় নাই। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় মুখার্জ্জি মহাশয়ের বাড়ীতে সংবাদ আসিল রামধন মারা গিয়াছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র মুখার্জ্জি মহাশয়ের বাড়ীতে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। চারিদিকে "আহা! বাছার কি হ'ল" ধ্বনিত হইতে লাগিল।

মুখার্জ্জিমহাশয় তখন কাছারী ঘরে ছিলেন। এই সংবাদ পাইয়াই তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। তখন তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন—আজই বুড়ীটাকে তাড়াইয়া

দিয়াছি। বুড়ীটা না পাবে খেতে আর না পাবে পর্‌তে। আমিই না হয় উহাকে এখানে আনিব, আনিয়াই বা কি করিব। তাহার সেই অন্তরের আগুন ত আর নিবাইতে পারিব না। আহা, বাছা কি করিল! আহা, বাছা কি সুন্দর ছেলেই ছিল—তার কি মাতৃ-ভক্তি, কি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, কি পরদুঃখ মোচনে ইচ্ছা? তাহার মা যখন কাঁদিত তখন সে কেমন করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিত, সে বলিত—'মা কাঁদিস্ কেন? আমি চাকরি করে টাকা এনে দিব; তাতেই তোর সব হবে।" তাই বাছা পড়াশুনা ছাড়ান দিয়া চাকরি কর্ত্তে গেল আবার তারই বা কি হ'ল।—যাক্ এখন বুড়ীটাকে সংবাদ দিতে হবে।

মাকে আর পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ দিতে হয় না। মায়ের প্রাণ আপনা হইতেই জানিতে পারে। যখন এই সংবাদ মুখার্জ্জি মহাশয়ের বাড়ীতে পৌঁছে তাহার পূর্ব্বে হইতেই রামধনের মায়ের মন হুহু করিতে থাকে। তিনি মুখার্জ্জি মহাশয়ের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া কুটীরে প্রবেশ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। তখন তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। কেবল সেই পূর্ব্বরাত্রির ছবিটী তাহার চোখ হইতে সরে নাই। শুইয়া কিন্তু আর ক্রন্দন করিতে পারিলেন না। কেবল অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এখন তাহার মনের সেই ছবিটী যেন স্পষ্টতর হইতে স্পষ্টতম হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার শূন্যদৃষ্টি দরজায় পড়িল।

তিনি এক অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি দেখিলেন। সেই ছায়ামূর্ত্তি ঠিক তাহার বাছা রামধনের ন্যায়। সেটী যেন ক্রমশঃ স্পষ্ট ও নিকট-বর্ত্তী হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

অবশেষে তিনি সেটীকে তাহার হারাধন রামধন মনে করিয়া "বাবা" "বাবা" বলিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বিছানা হইতে উঠিয়া কোলে করিতে ছুটিয়া গেলেন, তখন উত্তর হইল—'আ-য়-মা-তু-ই ও আ-য়।'

শ্রীপ্রভাকর মিত্র।